ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২
১৩৭০

সূচনা

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন বাংলা দেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নব জাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। এ দেশের মানুষ তখন ভারতের অতীত সাধনার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে বসেছে ; পাশ্চাত্ত্য জগতের মহতী চিন্তাধারার সঙ্গেও যোগ স্থাপন করতে পারে নি তারা। শুধু পৌরাণিক সংস্কারের অন্ধ তমসার মধ্যে তারা তখন ঘোরপাক খেয়ে মরছিল। রামমোহন এসে এই সর্বনাশা অন্ধকারের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেন। তিনিই প্রথম বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার, কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, মণ্ডুকোপনিষদ ও ঈষোপনিষদ বাংলা ভাষায় ও বেদান্ত, কেনোপনিষদ ও ঈষোপনিষদ ইংরিজীতে অনুবাদ করেন। পুরাণের কাহিনীগুলোকে একান্ত অন্ধতায় ধর্মের উপাদান ভেবে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের লোক যখন জড়তার পঙ্কে নিমজ্জিত, তখন রামমোহনই বেদান্ত ও উপনিষদের কথা দেশবাসীদের শোনান। একদিকে তিনি হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিকে দূর করবার চেষ্টা করেছেন, অন্য দিকে তিনি খৃশ্চান মিশনরীদেব সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ভারতবর্ষের লোক নিছক মূর্তিপূজক ও ঘোর কুসংস্কারী—এই অপবাদ খৃশ্চান মিশনরীরা বেপরোয়াভাবে তখন ছড়াচ্ছেন এ দেশে, ভারতবর্ষের লোকদের খৃশ্চান করবার অভিপ্রায়ে। রামমোহন তখন ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ যে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধারণা আর খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ যে ভুল তা নিয়ে ডা. মার্শমান্ প্রভৃতি খৃশ্চান মিশনরীদের সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছেন ও তাঁদের পরাস্ত করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অন্ধ গোঁড়ামির কাছে একেবারেই নতি স্বীকার করেন নি। খৃষ্টদেবের জীবন ও বাণী বিশ্বমানবের অমূল্য সম্পদ বলে তিনি স্বীকার করেছেন এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত করে খৃষ্টদেবের জীবন ও বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আমাদের আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয় ইস্‌লামের জাতিভেদরহিত উদারতার মধ্যে মহত্ত্বের সন্ধান করতে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। শুধু বাংলা দেশের কিংবা ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম হিন্দু, খৃষ্টীয় ও ইস্‌লাম ধর্মত্রয়ের তুলনামূলক অনুশীলনের সূত্রপাত করেন।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয় জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে রামমোহনের দান অসামান্য। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন কুলীনপ্রথা, কন্যাবিক্রয়প্রথা, জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে এবং পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার লাভের সপক্ষে আন্দোলন চালান। রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত তিনিই করেন। ভারতীয়দের জুরি নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। বহু হিন্দু-মুসলমানের সহি-যুক্ত একটি দরখাস্ত তিনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাখিল করেন। এই দরখাস্তের সঙ্গে নিজে একটি দীর্ঘ মন্তব্য জুড়ে দেন। তিন বছর আন্দোলন করবার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া জাস্‌টিসেস্ অফ্ পিস এণ্ড জুরিস এ্যাক্ট পার্লামেণ্টে পাশ হয় ভারতীয়েরা জুরিতে স্থান পাবার অধিকার লাভ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' এই আইন পাশ হবার জন্যে রামমোহনকে অভিনন্দন জানান।

প্রেসের স্বাধীনতা নিয়েও রামমোহন প্রবল আন্দোলন করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ এ্যাডাম্ প্রেসের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে Licensing System প্রবর্তন করেন। রামমোহন ও তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই লাইসেন্স্ ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ্যাডামের এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেন। সেই আপীলে রামমোহন বলেন :
"Every good ruler who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast Empire and therefore he will be anxious to afford to every individual the readiest means of

bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this most important object, *the unrestrained liberty of publication is the only effectual means that can be employed.*"

হাউস অফ্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষ্য দেবার সময় রামমোহন দাবী জানান যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীও বিচারক নিযুক্ত হক, সিভিল ও ক্রিমিনল আইন লিপিবদ্ধ করা হক, গভর্নমেণ্টের ব্যয় হ্রাস করা হক ও পেশাদার স্থায়ী সৈন্যদল (standing army) তুলে দিয়ে চাষীদের অস্ত্র ব্যবহার করবার শিক্ষা দিয়ে প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করা হক। এইগুলির সঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে স্বীকার করে তাকে জুরির ক্ষমতা দেওয়া হক এই মতও তিনি ব্যক্ত করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে চাষীর খাজনার হার বেঁধে দেওয়ার দাবী জানান রামমোহন। চাষীদের উপর জমিদারদের অত্যাচার যে কি নির্মম তার কথা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারী কমিটির কাছে সাক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : "The condition of the cultivators is very miserable, they are placed at the mercy of the Zamindar's avarice and ambition . . . the landlords have met with indulgence from government in the assessment of their revenue while no part of it is extended towards the poor cultivators."

হাটে ব্যাপারীদের কাছ থেকে তোলা নেওয়ার বিরুদ্ধে রামমোহন তাঁর মত ব্যক্ত করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে নুনের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার লোক এই নুন তৈরির কাজ করত। তাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। এ দিকে নুনের একচেটিয়া ব্যবসা করে কম্পানীর লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটছিল। রামমোহনের আন্দোলনের ফলে নুনের একচেটিয়া ব্যবসা কম্পানীর হাত থেকে চলে যায়। নুন সস্তা হয়, ভালো নুন পাওয়া সুগম হয় ও লক্ষাধিক লোক ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে রেহাই পায়।

বিলাস-সামগ্রীগুলির উপর ট্যাক্স বসিয়ে গরীবের উপর থেকে ট্যাক্সের ভার লাঘব করবার প্রস্তাব রামমোহন আনেন।

রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভারতের বিদেশী গভর্নমেণ্ট শিক্ষা-সংস্কার করতে রাজী হন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতলব ছিল যে ভারতবর্ষে

শুধু টোলের শিক্ষাপদ্ধতি চালু রাখার। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে রামমোহন লর্ড এ্যামহার্স্টকে শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে একটি চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের দাবী জানান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হবার সাঁয়ত্রিশ বৎসর আগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী রামমোহন করেছিলেন।

সংবাদপত্রের এলাকায় রামমোহনের দান কম নয়। তিনি নিজে 'সংবাদ কৌমুদী' নামক বাংলা সাপ্তাহিক ও 'মিরাট-উল্‌-আখবার' নামক পারস্যভাষায় সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া 'দি বেঙ্গল গেজেট', 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

পৃথিবীর সব দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন রামমোহন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রবর্তনের খবর পেয়ে টাউন হলে ভোজ দেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সহানুভূতি জানান ও আয়র্লণ্ডে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'মিরাট-উল-আখবার' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন তিনি।

এই অসাধারণ প্রজ্ঞাবান পুরুষ তাঁর কর্মজীবনের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরকে। দ্বারকানাথ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের চেয়ে তিনি বয়েসে প্রায় বাইশ বছরের ছোট ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি যে কর্মকুশলতা দেখিয়েছিলেন ও প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তারই একটা জনশ্রুতি এ কাল পর্যন্ত গুঞ্জিত হচ্ছে। অথচ এই পরিচয় দ্বারকানাথের যথার্থ পরিচয় আদবেই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রতিটি সমস্যার সমাধানে দ্বারকানাথ সে যুগের পুরোগামীদের অন্যতম। রামমোহনের পরে দ্বারকানাথই সে যুগের বাংলার সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেশভক্ত পুরুষ। এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে দ্বারকানাথের সাহচর্য না পেলে রামমোহনের বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। রামমোহনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল দ্বারকানাথ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রতিটি সংস্কার-প্রচেষ্টায় রামমোহনকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।

পার্শিয়ান ও এ্যারেবিক ভাষায় দ্বারকানাথের যথেষ্ট দখল ছিল। এই দুই ভাষাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, লিখতে পারতেন। ফার্গুসন সাহেবের কাছে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। রাজস্ববিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। ইয়োরোপীয় ধাঁচের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তিনিই সর্বপ্রথম শুরু করেন 'কার টেগোর এণ্ড কম্পানী'-র প্রতিষ্ঠা করে। কৃষি ও ব্যবসায় সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে পনেরো লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে দ্বারকানাথ 'ইউনিয়ন ব্যাংক' নামক জয়েণ্ট-স্টক ব্যাঙ্ক পত্তন করেন। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের বাইশে জুন কলিকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে স্টীমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার জন্যে চোদ্দ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। দ্বারকানাথ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'ল্যাণ্ডহোলডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এই প্রথম। হিন্দু কলেজ পুনর্গঠন করবার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভ্য ছিলেন ডেভিড হেয়ার, ডা. উইল্‌সন্‌ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মফস্বলের পুলিশ-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে গভর্মেণ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় দ্বারকানাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করবার প্রস্তাব আনেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন এই কমিশনের সদস্য। কলিকাতায় মেডিকল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। মেডিকল কলেজ প্রতিষ্ঠাকরণে দ্বারকানাথের দান অসীম। কোনো হিন্দু তখন শবচ্ছেদ করতেন না। দ্বারকানাথ নিজে শবচ্ছেদগৃহে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের উৎসাহ দেন শবচ্ছেদ করতে। চারটি ছাত্রদের তিনি ইংলণ্ডে পাঠান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যে।

সতীদাহ নিবারণ করবার জন্যে যখন রামমোহন আন্দোলন চালান তখন দ্বারকানাথ সর্বশক্তি নিয়োগ করে রামমোহনকে সাহায্য করেন। রামমোহনের মতবাদ প্রচারের সাহায্য করবার জন্যে দ্বারকানাথ অনেকগুলি পত্রিকার স্বত্ব

কিনে নেন। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। দ্বারকানাথ ছিলেন তার অন্যতম স্বত্বাধিকারী। প্রসিদ্ধ ইংরিজী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া গেজেট', সেটিরও স্বত্বাধিকারী ছিলেন দ্বারকানাথ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'জন বুল্' কাগজটি কিনে নেন দ্বারকানাথ। এই পত্রিকার নাম বদল করে 'ইংলিশম্যান' নাম দেওয়া হয়। 'বেঙ্গল হরকারু' কাগজটিতে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বারকানাথ। বহু অর্থ দিয়ে এই কাগজটিকে তিনি সাহায্য করেন। এইভাবে সংবাদপত্র মারফত দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে পুষ্ট করবার সচেতন চেষ্টা দ্বারকানাথের পূর্বে কেউ করে নি এ দেশে।

রামমোহনের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে আমরা আগেই দেখেছি যে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পাশে ছিলেন দ্বারকানাথ। রামমোহনের মৃত্যুর পর প্রেসের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে আবার যখন গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে চেষ্টা হয় তখন দ্বারকানাথ তার প্রতিবাদ করেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে প্রেসের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টার প্রতিবাদে টাউন হলে সভা হয়। সেই সভায় দ্বারকানাথ বলেন : "I had ever felt a deep interest in the removal of all restrictions on the freedom of the Press and had partaken in every public expression of feeling on the subject."

১৮৪২ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। জুন মাসে তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছন। সার রবার্ট পীল ও মারকুইস্ অফ্ ল্যান্স্-ডাউন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পার্লামেণ্টের অধিবেশন দেখতে যান। ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের সঙ্গে আলাপ করেন। এডিনবরার ইউনিটেরিয়ন্ এসোসিয়েশন দ্বারকানাথকে অভ্যর্থিত করেন এক সভায়। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে যান ও প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত হুম্বোল্ড্, প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক গুইজো প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৮৪২ সালের শেষাশেষি তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও উদারনীতি-মতাবলম্বী জর্জ থম্সনকে আমন্ত্রণ করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। তার চার বছর আগে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ দে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'Society for the Acquisi-

tion of Generaı Knowledge' স্থাপন করে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সূচনা করেন। তারাচাঁদ ছিলেন রামমোহনের শিষ্য। জর্জ থম্সন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় একটি বৈঠকে জর্জ থম্সন 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তার দু হপ্তা পরে ২০শে এপ্রিল তারিখে Bengal Brıtısh Indıa Socıetyর পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানসভায় সভাপতিত্ব করেন জর্জ থমসন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রস্তাব আনেন আর সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন রামমোহনের আর-এক শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করবার জন্যেই দ্বারকানাথ জর্জ থম্সনকে নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বারের মতো দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে যান। গ্ল্যাডস্টোন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ভাব ছিল। একবার গ্ল্যাডস্টোন দ্বারকানাথের বাড়িতে এসে একঘণ্টার উপর তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন ভারতবর্ষের অবস্থা নিয়ে।

এ ছাড়া ম্যাকসমূলার, চার্লস ডিকেন্স্, উইলিযাম থ্যাকারে প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকেরা দ্বারকানাথের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পয়লা আগস্ট তারিখে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামমোহন বাংলার কৃতি ও ও প্রতিভাবান পুরুষ দ্বারকানাথের প্রাণ-ঢালা সহযোগিতায় দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের শিল্প-বিপ্লব সাধন করবার উপায় সম্বন্ধে রামমোহনের মতের সঙ্গে দ্বারকানাথের মতের আশ্চর্য মিল ছিল। এই পুস্তকে আছে তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা।

ফাল্গুন, ১৩৬৯ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বজাতিপ্রীতি ব্যবসায়ীদের নীতি নয়। হওয়াও সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে যেখানে আল ভেঙ্গে অন্য মানুষ এসে ঢুকেছে, অন্যের জায়গা হয়েছে মনের মধ্যে, সেখানে আপনার স্বার্থ না ছেড়ে ব্যক্তির উপায় নেই। ব্যবসায়ী সেই জাতের মানুষ যে লাভের কাণাকড়িও ছাড়তে রাজী নয়। এই জাতের মানুষের স্লোগান হচ্ছে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—নয়, এদের স্লোগান হচ্ছে—আপনি লোটাই সেরা কাম আর তাতেই বাপের নাম। সব পিপাসার মধ্যেই একটা আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মাভিমুখিনতা আছে, তাই মুনাফা লোটার পিপাসার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে অন্য পিপাসাগুলির চরম নিবৃত্তি না থাকলেও একটা সাময়িক পরিতৃপ্তি আছে। মুনাফাধর্মী মানুষদের এই সাময়িক নিবৃত্তি, সাময়িক পরিতৃপ্তি বলে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচিতি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লোহার সিন্দুকে বন্দী করবার জন্যে ব্যবসায়ীরা মরিয়া। লুটের বখরা এরা কারো সঙ্গে করতে রাজী নয়। একদেশের লোক তাদেরও সুযোগ দাও দুপয়সা করতে—এ ধর্ম-বুলিতে এদের হৃদয়ের চিড়ে আদবেই ভেজে না। ব্যবসা করতে নেমেছি, ব্যবসা করব, অর্থাৎ যেখানে যা পাব নিজের লোহার সিন্দুকের উদরস্থ করব। সেখানে জাতের বেরাদারি নেই, এক ছাপ-মারা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিই আমরা, সেই দোহাইয়ের বালাই নেই, এক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আমাদের বাস অর্থাৎ আমরা একদেশের লোক, এই গদ্‌গদ মিঠে বুলিরও কদর নেই। জঙ্গলের পশুদের পশুস্বতন্ত্রতা মানুষের সমাজে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা নাম নিয়ে রাজ-সিংহাসন দখল করে বসেছে। ব্যবসায়ী মানুষ তাই দেশ মানে না, জাতি মানে না। বিশ্বাত্মবাদী মানুষও দেশকে ও জাতিকে চরম বলে মানে না কিন্তু সে না-মানার মধ্যে রয়েছে বিশ্বমানবকে মানা। ব্যবসায়ীর দেশ ও জাতি না-মানার মধ্যে আছে বিশ্বমানবকে অস্বীকার করা, শুধু নিজের লোভ ও ভোগকে মানা। তাই শত্রুর কাছে যুদ্ধের সময়ে গোলাবারুদ বেচে মুনাফা লুটতেও ব্যবসায়ীদের বাধে না। দুনিয়ার সঙ্গে নাড়ির যোগ-হারা মানুষের দল হচ্ছে ব্যবসায়ীরা।

যে চার্টার-এ্যাক্ট্ অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর পত্তন হয় সেই এ্যাক্ট্ অনুযায়ী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। তাছাড়া বাণিজ্য কিংবা কৃষিকার্য করবার উদ্দেশ্যে যদি কোনো ইয়োরোপীয় এ দেশে এসে বাস করতে চাইত তাহলে তাকে ভারতবর্ষে না আসতে দেবারও পূর্ণ ক্ষমতা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। এই অপ্রতিহত একচেটিয়া অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কেউ যেন ঘা দিতে না পারে এই অধিকারে, সেই দিকে কম্পানীর খুব তীক্ষ্ণ নজর ছিল। বাণিজ্যের অবাধ অধিকার (Free trade) কম্পানীর দৃষ্টিতে ছিল নরহত্যার সমান পাপ। সেই সময়কার কম্পানীর কর্তাদের বাণিজ্যের অবাধ অধিকার সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিল তাব দুটি তিনটি নমুনা দিই।

অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade) গ্রহণ করলে কম্পানীর কি ক্ষতি হবে সেটা বর্ণনা করে মি. ফ্রান্‌সিস ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে এক রিপোর্ট পাঠান বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে। সেই রিপোর্টে ফ্রান্‌সিস বলেন:

> জমির চাষ ইয়োরোপীয়দের হাতে তুলে দেয় যে ব্যবস্থা, অন্য সব বিবেচনা বাদ দিয়ে শুধু এই জমি তুলে দেওয়ার দিক থেকেও যদি এই ব্যবস্থার বিচার করা যায় তো বলতেই হবে যে 'এই ব্যবস্থা কম্পানীর রাজস্বের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।' এ দেশে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা দৃঢ়, নিয়মিত ও দীর্ঘসূত্রতাহীন হওয়া দরকার। এ দেশের লোক দেওয়ানের কিংবা দেওয়ান-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে চিরদিন অভ্যস্ত। 'যদি ব্রিটিশেরা কিংবা তাদেব কর্মচারীরা কৃষিপ্রতিষ্ঠান ভাড়া করবার সুযোগ পায় তাহলে কম্পানীর প্রাপ্য বকেয়া খাজনা আদায় করবার জন্যে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না।' আমার মনে হয় এই ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় হবে না, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আদায় ব্যর্থ হবে আর শেষ পর্যন্ত কম্পানীর এই দেশের মালিকানাও সংকটাপন্ন হবে (কোটেশান—লেখক)।

মি. ফ্রান্‌সিস-এর রিপোর্ট থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করে যদি ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে অবাধ বাণিজ্য করবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে কম্পানীর আয় কম হয়ে

যাবে, এই তাঁর ভয়। ভারতবাসীরা দেওয়ানের বিচার অর্থাৎ অত্যাচার, জুলুমবাজি ও জোর করে আদায়, মাথা পেতে মেনে নিত, ইয়োরোপীয়েরা তো তা মানবে না। তারা যদি কৃষি-ফার্মের মালিকানা পায় তাহলে তারা খাজনা না দিলে সে খাজনা আদায় করবার জন্যে সুপ্রীমকোর্টের শরণাপন্ন হতে হবে, আর তার ফলে আদায় কমে যাবে আর শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের উপর কম্পানীর দখলও টেকানো শক্ত হবে। ইয়োবোপীয়দের ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্য করবার সুযোগ দিলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে বেপবোয়া লুঠ করছিল, বে-আইনী আদায় করছিল, সেসব বন্ধ হয়ে যাবে। জিনিসের দাম কমে যাবে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ফলে, চাষীদের উপর যে জুলুম চলছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে ইয়োরোপীয়েবা যদি কৃষি-ফার্মের মালিক হয়ে বসে, আইন-সম্মত উপায়ে খাজনা নিতে হবে তখন—এসব কি কখনো বরদাস্ত করতে পারে লুঠতরাজে সিদ্ধহস্ত যথেচ্ছাচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকেরা কিংবা তাদের কর্মচারীরা ?

ইয়োরোপীয়েরা বেশী সংখ্যায় ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করলে কিংবা কৃষি-ফার্ম পত্তন করে বসলে যে কি ভয়ানক ক্ষতি হবে তা চিন্তা করে মি· শোর নামক কম্পানীর একজন হোমরাচোমরা কর্মচারী যে কি পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তা বলা যায় না। তাঁর যুক্তি কিন্তু অন্য, আর সে যুক্তি খুবই উপভোগ্য। মি· শোর বলছেন :

> এ কথা একেবারে স্পষ্ট যে গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের চালচলনের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠ হবার স্বাভাবিক পবিণতি। আগে তাদের ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মেশবার অধিকার দেওয়া হত না। 'সেই অধিকার পেয়ে তারা দেখতে পেয়েছে যে আমরাও দুর্বলতা ও পাপ মুক্ত নই এবং অন্য সবার মতো ইয়োরোপীয়রাও লোভের বশীভূত। আমাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বা জাতীয়ভাবে যে শ্রদ্ধা আগে তাদের ছিল তা এখন নেই। এখন নিজেদের তারা আমাদের সমপর্যায়ের বলে মনে করে' (কোটেশান—লেখক)।

মি· শোর-এর ভারী ভয় পাছে এ দেশের লোক ইংরেজ বণিকদের আসল

চেহারাটা কাছ থেকে দেখে ফেলে বণিক-দেবতাগুলির সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। শোর সাহেবের আপশোষের শেষ নেই যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদের আসল রূপ ধরে ফেলেছে এ দেশের লোক। ইংরেজদেরও যে অনেক দোষ থাকতে পারে ও আছে, তারাও যে নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এটা ভারতবাসীরা বুঝে নিয়েছে, এটা কি কম দুঃখের কথা! শোর সাহেবের মতে এইজন্যেই ভারতীয়দের ভক্তি কমে গেছে ইংরেজের উপর আর তার ফলে ভারতীয়েরা নিজেদের ইংরেজদের সমান সমান বলে ভাবতে শুরু করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বেশি মেশামেশি হলেই চটক ভেঙ্গে যাবে, অল্প মেশামেশির ফলেই এটা ঘটেছে আর বেশি মাখামাখি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে শোরের ভয় ও ভাবনা। তাই তাঁর মতে ইংরেজ-দের বেশি সংখ্যায় এ দেশে আসতে দিলে মারাত্মক ভুল করা হবে।

এখানেও মতলবটি সুস্পষ্ট। ইংরেজদের যাতে এ দেশের লোক ভয় করে, সম্ভ্রম করে, দেবতা গোছের কিছু-একটা ভাবে সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। এটা একটা চতুর ও খুব প্রয়োজনীয় কৌশল অন্য দেশকে দখল করে সে দেশের লোকদের গোলাম বানাবার ও লোটবার।

এবারে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে এসে বাণিজ্য করতে দেওয়া ও চাষবাস করতে দেওয়া সম্বন্ধে তখনকার গভর্নর-জেনারল্-এর মতটা একবার দেখা যাক। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর গভর্নর-জেনারল্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের লিখছেন:

> যদি প্রস্তাবিত পদ্ধতি (অবাধ বাণিজ্য) গ্রহণ করা হয়, তাহলে অসংখ্য ইয়োরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে জড়ো হবে। 'কম্পানী-পরিত্যক্ত শিল্পের কেন্দ্রগুলো স্বভাবতই তারা দখল করে বসবে।' তখন উগ্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার এবং মূল্যবৃদ্ধির উদ্ভব হবে এবং খেলো কাপড় বাজার ছেয়ে যাবে। 'তাঁতিরা সবার কাছ থেকেই অগ্রিম টাকা নেবে', প্রত্যেকে নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা নিজেই করবে। বণিকদের মধ্যে এবং বণিক ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে বিবাদ হবে অনিবার্য। খুব সম্ভবত দেশ তখন বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে। এ উপায়ে স্বাধীনতা ও বাণিজ্যের প্রসার কতদূর হতে পারে তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য নয়! (কোটেশন—লেখক)।
> ইয়োরোপীয়েরা বেশি সংখ্যায় এ দেশে এলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে

উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি ছেড়ে দিয়েছে সেগুলি এরা দখল করবে, ব্যবসায়ে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে, একচেটিয়া বাণিজ্যের মজা লোটবার আর সুযোগ থাকবে না কম্পানীর, এ মর্মান্তিক অবস্থা কম্পানীর নায়েব গভর্নর-জেনারল্ সাহেব কি করে ঘটতে দিতে পারেন! তাছাড়া তাঁতীরা নানা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দাদন পাবে, তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে, এটাই বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্তারা কি করে সহ্য করেন? কম্পানীর হাতে তাঁতীদের দুর্দশার তো সীমা ছিল না। যত অল্প দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাপড় কেনা যায় তার ব্যবস্থা কম্পানীর লোকেরা করেছিল। ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার কম্পানীর হাতে থাকায় অল্প দামে কিনে চড়া দামে বেচবার সব সুযোগ কম্পানী ভোগ করেছিল। এখন অন্য লোকদের ব্যবসার সুঁযোগ দিলে দু হাতে লোটবার যে বিমল আনন্দ কম্পানীর আমলারা এতদিন ভোগ করে আসছিল তাতে বাদ সাধতে হয়। কম্পানীর নায়েব গভর্নর-জেনারল্ সেটা কি করে বরদাস্ত করে? তাছাডা জালিয়াতী যুক্তি দিয়ে লোক ঠকানো যে শুধু এ কালেই চলে তা নয়, সে কালেও দিব্যি চলত। গভর্নর-জেনারল্ সাহেবের চিঠি তার প্রমাণ দিচ্ছে। গভর্নর-জেনারল্ লিখছেন যে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু কবলে আর ইয়োরোপীয় এ দেশে এসে বাণিজ্য করা শুরু করলে বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে আর তার ফলে জিনিসের দাম বাডবে আর কাপডও আগের চেয়ে খারাপ তৈরি হবে (enhanced prices and debased fabrics follow)। কম্পানীর ডিরেক্টর্-দের বুদ্ধির বহর কি ছিল তা জানবার উপায় আজ নেই, তবু জেনে শুনে ঠকতে চায় এমন লোক আর নেহাৎ নির্বুদ্ধি লোক ছাডা গভর্নর-জেনারলের এই যুক্তি কেউ মানতে পারে বলে তো মনে হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জিনিসের দাম বাড়ে না, কমে, আর জিনিস নীরেস হয়ে যায় না বরঞ্চ আরো সরেস হয় রেষারেষির ফলে, কেন-না যার জিনিস অন্যের চেয়ে ভালো সে-ই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতে। কম্পানীর ডিরেক্টরেরা গভর্নর-জেনারলের এই অসম্ভব যুক্তি গোগ্রাসে গিলেছিলেন কি-না তা জানতে কৌতূহল হয়।

আসল কথাটা হচ্ছে যে ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করবার ও চাষবাস করবার অধিকার দেওয়া উচিত, না উচিত নয়, এই নিয়ে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যে লড়াইটা চলছিল সেই লড়াইটা আসলে

ছিল—বণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার-এর (Monopoly) নীতির সঙ্গে বাণিজ্যের অবাধ অধিকারনীতি-র (Free trade) লড়াই।

যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর যখন সূত্রপাত হল, ক্যাপিটালিজমের সেই প্রারম্ভকালে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকাব যাদের হাতে ছিল তারা যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর সম্প্রসারণে বাধা দিয়েছে। সামন্ত সমাজব্যবস্থার যুগে জমিদারী-প্রথার সঙ্গে কুটীরশিল্প-প্রণালী যুক্ত ছিল এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাঁধনে। যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী চালু হলে চারিদিকে কলকারখানা গজিয়ে উঠবে, তার ফলে গ্রামেব কুটীরশিল্প থেকে জমিদারেরা জবরদস্তি যে আদায়টা করত সেটা আর সম্ভব হবে না। এইজন্যেই যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনে জমিদারেরা এত বাধা দিয়েছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ছলে-বলে-কৌশলে রাজত্ব কায়েম কবে নিল। এই রাজত্ব কায়েম করা তো পরমার্থ সাধনের জন্যে নয়, অসভ্যদের সভ্য করার (Hellenic mission) জন্যেও নয়। পরমার্থকে সিকেতে তুলে রেখে অর্থ কি করে লোটা যায়, অসভ্যদের দেশে যাকিছু লভ্য আছে তা কি করে ঝুলি ভরে সাগরপারে পাঠানো যায় তারই ভাবনায় বিভোর ছিল এই বিদেশী বণিকের দল। যে অর্থনৈতিক নীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অনুসরণ করল ভারতে, যে নীতি কার্যকরী করবার জন্যে তাদের বাদশাহী পত্তন করা ভারতবর্ষে, সেই নীতির মূলসূত্র ছিল ভারতবর্ষ থেকে যতদূর সম্ভব কাঁচা মাল আর কুটীরশিল্পজাত জিনিসগুলি লোটা, বিশেষ করে কাপড়, আর সেগুলি ইংলণ্ডে পাঠানো, আর ইংলণ্ডের কলকারখানায় তৈরী জিনিসগুলি ভারতবর্ষে এনে ভারতের বাজারে বিক্রী করা। ভারতবর্ষে যাতে কলকারখানা গজিয়ে না ওঠে, ভারতের কুটীরশিল্পগুলিও যাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ভারতবর্ষ যাতে ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলোর কাঁচা মালের যোগানদার হিসেবে বেঁচে থাকে—এই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক নীতি। বাংলার তাঁতীদের মেরে ইংলণ্ডের কলের তৈরী কাপড়ে যাতে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলা যায় তার জন্যে কম্পানীর আমলাদের বর্বর চেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। বিলেত থেকে যেসব জিনিস আমদানী করা হত সেগুলো খুশিমত চড়া দামে বেচত কম্পানী, কেন-না কম্পানীর ছিল একচেটিয়া অধিকার তার দখল-করা এলাকার বাজারে।

ইয়োরোপের কারখানার তৈরী জিনিস এনে অন্য কেউ ইয়োরোপীয়, কম্পানী অধিকৃত এলাকার বাজারে বিক্রী করতে পারত না। কৃষির উন্নতির দিকেও কম্পানীর নজর ছিল না। যে কাঁচা মালগুলি ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিল্পগুলির জন্যে প্রয়োজন ছিল শুধু সেই কাঁচা মালগুলির উৎপাদনের দিকে তাদের নজর ছিল। এই ছিল কম্পানীর অর্থনৈতিক নীতি আর এই নীতির ফাঁস গলায় পরিয়ে কম্পানী-শাসিত এলাকার লোকদের আধমরা করে রেখেছিল কম্পানী। কম্পানীর একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের আওতায় ভারতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের সেই স্রোতহীন মরা জলে অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের ঢেউ এসে পৌঁছলে একটা স্রোত শুরু হবার সম্ভাবনা জাগে বৈকি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাইরে থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা যারা অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের নীতি (Free trade) গৃহীত হলে আসবে তারা কি মুনাফা লোটার উদ্দেশ্য ছাড়া আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে? একচেটিয়া ব্যবসা-অধিকারের মজা-লুটনেওয়ালা ব্যবসায়ীরা হক, কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের সুযোগ-লুটনেওয়ালা ব্যবসায়ীরা হক, দু দলেরই উদ্দেশ্য এক—পকেট-থলে-সিন্দুক ভরে মুনাফা লোটা। তফাত হয় শুধু ব্যবসার ধরনটা, ব্যবসার উদ্দেশ্য একই থেকে যায়। কিন্তু এটাও জানা দরকার যে ধরনটার তফাত অর্থাৎ রীতির তফাত থেকেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। সব সময়ে নীতির তফাত থেকে পরিবর্তনের সূত্রপাত নয়। কিছু লোক যেখানে একচেটিয়া-ভাবে ব্যবসা করে মুনাফা লুটছে সেখানে যখন হুড়মুড় করে অগুনতি ব্যবসায়ীরা এসে ঢুকে পড়ে, তখন জোয়ার আসে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদ্ধ জলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন মুনাফা লোটবার জন্যে নতুন নতুন ধান্দা জাগে ব্যবসায়ীদের মনে। তার ফলে নতুন নতুন জিনিস তৈরি হয় আর নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করবার দিকে দৃষ্টি পড়ে ব্যবসায়ীদের। ইতিহাসের ধারা তলিয়ে দেখলে আমরা এইটেই দেখি যে লোভী মানুষ ব্যক্তিগত লোভের উস্‌কানিতে কাজ করে চলে কিন্তু তার ব্যক্তিগত স্বার্থের ফাটলের ভিতর দিয়ে সমাজের কল্যাণের তরু মঞ্জরিত হয়। এই মুনাফাধর্মী সমাজে মানবসমষ্টির কল্যাণ হচ্ছে লোভী মানুষের স্বার্থধর্মী কাজের বাই-প্রডাক্‌ট্ অর্থাৎ পড়ে-পাওয়া অযাচিত ফল।

তাই ধর্মনীতিরও দিক থেকে বিচার করলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার-ভোগীদের কোনো পার্থক্য না থাকলেও, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের জায়গায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের প্রবর্তন অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করে।

শুধু যে ভারতবর্ষেই ইতিহাস এই পথ ধরে চলেছিল তা নয় সিংহলেও এই একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সঙ্গে লড়াই চলছিল অবাধ বাণিজ্যনীতির। দিনেমারদের হাত থেকে সিংহল যখন ইংরেজদের হাতে গেল তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতেই সিংহলের শাসনভার ন্যস্ত হল। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এই ব্যবস্থা করে নিল যাতে এই কম্পানীর সাহেবরা ছাড়া আর-কোনো ইয়োরোপীয় এসে সিংহলে ব্যবসা বাণিজ্য ও বসবাস না করতে পারে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট সিংহলের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিল। সিংহলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির কি উপায়ে উন্নতিসাধন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করবার ভার দেওয়া হল সার অ্যালেক্জান্দার জন্স্টনের উপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে।

সার অ্যালেক্জান্দার যে রিপোর্ট দাখিল করলেন তাতে বললেন যে যদি সিংহলের ব্যবসা বাণিজ্যের ও কৃষির উন্নতি সাধন করতে হয় তাহলে বিজ্ঞান, যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী ও ইয়োরোপীয় মূলধন—এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন সিংহলে; আর তার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করতে হবে ও ইয়োরোপীয়দের সিংহলে এসে বাণিজ্য ও কৃষির জন্যে বসবাসের অধিকার দিতে হবে। সার অ্যালেকজান্দারের এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হল আর ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষির জন্যে ইয়োরোপীয়দের সিংহলে এসে বাস করার বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যেসব নিয়মকানুন তৈরি করেছিল সেগুলো রদ করে দেওয়া হল।

সিংহলে যন্ত্রবিপ্লব (Industrial revolution) শুরু হয়ে গেল যার আর-এক নাম ইতিহাসের পরিভাষায়—বুর্জোয়া বিপ্লব। বাংলার দিকে আবার

ফিরে তাকানো যাক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের শ্বাসরোধ-করা ফাঁস তখন বাংলার গলায় পরানো রয়েছে। একচেটিয়া বাণিজ্যের কারাগারে বাংলাকে বন্দী রেখে তাকে শুষে নিচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী। যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না সে অবস্থায়, নতুন কৃষিজাত কাঁচা মালের ফসল ফলাবার সম্ভাবনাও না। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের সম্প্রসারণের সব পথঘাট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী। তখন ব্যক্তিগত লাভের আশায় যারা সেই দুর্গের দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকতে এল তারা বান আনল বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কড়াকড়ি চলল, বাঁধন একটুও আলগা হল না। নীলকর সাহেবেরা গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানা পাওয়ার জন্যে বার বার আর্জি করল বাংলার গভর্মেণ্টের কাছে কিন্তু তাদের সব আবেদনই অমঞ্জুর থেকে গেল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার গভর্মেণ্টের ইচ্ছে হল বাংলা দেশে কফির চাষ শুরু করতে। কিন্তু ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হবার অধিকার না দিলে কফির চাষ শুরু করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা গভর্মেণ্ট বাধ্য হল ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হবার অধিকার দিতে—অবিশ্যি সেই অধিকার দেওয়া হল আটঘাট বেঁধে বিশেষ সর্তে। নিরুপায় হয়ে সেইসব সর্ত মেনে নিয়েই কফির চাষের জন্যে জমি কিনল ইয়োরোপীয়েরা। শুরু হল কফির চাষ বাংলাদেশে। ইয়োরোপীয়েরা তাই বলে হাল ছেড়ে চুপ করে বসেছিল মনে করলে ভুল করা হবে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা-বাসিন্দে ইয়োরোপীয়েরা একটি সভা ডাকল টাউন হলে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাস-বিষয়ে যেসব আইনগত বাধা ছিল সেই বাধাগুলিকে অপসারিত করবার জন্যেই এই সভা ডাকা হয়। বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি ও কৃষির উন্নতি সাধন করতে ইংরেজ বণিকেরা যে সাহায্য করেছে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ইংরেজ বণিকদের মুখ থেকেই শোনা গেল সে দিনের সভায়। সভা থেকে প্রস্তাব পাশ করে দরখাস্ত হিসেবে সেটা পাঠানো হল গভর্মেণ্টের কাছে—কিন্তু কোনোই ফল ফলল না। গভর্মেণ্ট তখনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ইশারাতেই ওঠে, বসে, চলে, তাই জয় হল কম্পানীর একচেটিয়া অধিকারনীতির।

এই মিটিংয়ের মাস তিনেক পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে

'একজন জমিদার' এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিবৃতি বের হল 'সংবাদ কৌমুদী'-পত্রিকায়। এই 'একজন জমিদার' আর কেউ নয়, স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিবৃতিটি উদ্ধৃত করার যোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখছেন :

কয়েক সপ্তাহ আগে টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হতে যে চিনি রপ্তানী হয় তার উপর শুল্কের হার সমান করে দেওয়ার জন্যে পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন করা এবং বৃটিশ-জাত প্রজাবর্গকে ভারতে অবাধ বাসস্থান দেওয়া। খোলামেলা এবং দীর্ঘ আলোচনার পর যখন অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হল তখন এক ধর্মযাজক, ঝগড়া করাই যাঁর স্বভাব ও পেশা, খোলাখুলিভাবে সভার উদ্দেশ্যের বিরোধিতার পরিবর্তে একজন এদেশীয় লোকের কাছে শেষোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি মতবিরোধিতা প্রকাশ করলেন এবং আমি জানতে পারলুম যে তাকে এবং তার মারফত অন্যদের পাল্টা আবেদন করতে রাজি করান। এই পাদ্রী ভদ্রলোক এখন তা তৈরি করছেন।

আমাদের এদেশীয় বন্ধুরা সেই ধর্মযাজক থেকে যা শুনেছেন তার থেকে তাঁরা এই ধারণা করেছেন যে টাউন হলের সভায় স্থিরীকৃত আবেদনের শেষ উদ্দেশ্য হল এদেশীয় জমিদারদের তাঁদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা এবং ইয়োরোপীয়দের এ দেশে ভূসম্পত্তি দেওয়া। তাছাড়া অগণ্য ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা, সেও এই আবেদনের উদ্দেশ্য।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা পাল্টা আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি করেছেন এবং সংশোধনের জন্যে এবং তার গুরুত্ব বাড়ে এমন কোনো চুক্তি বাৎলে দেবার জন্যে তা উক্ত ধর্মযাজকের হাতে দিয়েছেন। কিন্তু একটি কুকর্মের সমর্থক বলে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন নি।

লেখায় এবং আলাপে তাঁরা ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের দ্বারা দেশব্যাপী নীল-চাষের অসুবিধা ও অনিষ্ট সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইয়োরোপীয়রা ধান-চাষের অধিকাংশ জমি নীল-চাষের জন্যে অধিকার করাতে এ দেশের লোকের প্রধান খাদ্য ধানের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং তার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনটনে অশেষ দুর্দশা ভোগ করছে।

এ দেশে যাঁর ভূসম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারী দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে এ কথা সুবিদিত যে 'নীল-চাষের জন্যে কী বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীল-চাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্নশ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার দিনে যেসব চাষী জমিদারের জবরদস্তিতে বিনামূল্যে বা অল্প পরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হত তারা এখন নীলকরদের আওতায় খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে; তারা প্রত্যেকেই নীলকরদের কাছ থেকে মাসিক চার টাকা বেতন পাচ্ছে। এবং অনেক মধ্যবিত্ত যারা নিজেকে ও পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারত না তারা নীলকরদের দ্বারা উঁচু বেতনে সরকার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মর্জি দ্বারা নির্যাতিত হয় না' (কোটেশান—লেখক)।

এ অবস্থা থেকে এ বিষয়টি সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের যদি অবাধ বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং ফলে যদি অধিক-সংখ্যক ইয়োরোপীয় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে চাষ, বাণিজ্য প্রভৃতি চালান তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা নিশ্চিতভাবে অধিকতর উন্নত হবে এবং জমিরও সদ্ব্যবহার হবে। 'অবশ্য এই অবস্থা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর জমিদারদের নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ হবে, কেন-না তাঁরা নিজ নিজ গণ্ডিতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিপীড়িত করতেই ইচ্ছুক' (কোটেশান—লেখক)।

সরকারের নিকট অনুসন্ধানপরায়ণ বিচারকরা সময় সময় যে রিপোর্টগুলি দাখিল করেছেন তা দেখলেই 'রায়তদের প্রতি জমিদারদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে'। তাছাড়া এমন অনেক জমিদার আছেন যাঁরা কচিৎ নিজের জমিদারী পরিদর্শনে যান। ম্যানেজারের উপরই তাঁদের যত বিশ্বাস, তার উপরই চাষাবাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। সাধারণত ম্যানেজারেরা বিশ্বাসের অপব্যবহার করে এবং নিজেদের সুবিধার জন্য রায়তকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত করে। তারা ভয় দেখিয়ে এবং জোরজবরদস্তি করে চাষীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করায় অনেক চাষী গ্রামান্তরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে

চাষীদের বাসস্থান খালি পড়ে থাকে, জমি পতিত হয়ে যায়। ম্যানেজারেরা তাদের মনিবের কাছে যে মিথ্যা অজুহাত দেয় তা হচ্ছে এই যে নীলকরদের অত্যাচারে খাজনা কমে গেছে, চাষ হচ্ছে না। এভাবে মনিবদের তারা অন্ধকারে ফেলে রাখে। (কোটেশন—লেখক)

এ অবস্থায় আমার এ কথা বলা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত যে ব্রিটিশ সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক ইয়োরোপীয় যে এ দেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করছেন যে তার বিরোধী, অথবা যে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে অবাধ বসবাসের বিরুদ্ধাচরণ করে—এই বসবাস অবিশ্যি বিচার-পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন-সাপেক্ষ—সে লোক এ দেশের লোকদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু। একজন জমিদার

দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই বিবৃতিটি নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা দেখবার জিনিস, বিশেষ করে এ কালে, যে কালে শঠতা সমকালীন সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-পদে প্রতিষ্ঠিতা। দ্বারকানাথ নিজে একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে জমিদারের দুষ্কর্মের সাফাই গাইবার কোনো প্রয়াস করেন নি দ্বারকানাথ। অকপটভাব তিনি প্রজাদের উপর জমিদারদের ও জমিদারদের কর্মচারীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বর্ণনা করেছেন। এই জমিদারেরাই যে চাষীদের উপর অত্যাচার ও তাদের বেপরোয়া লুট কায়েম রাখবার জন্যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কিনে কৃষিকার্য করতে বাধা দিচ্ছে সে কথা দ্বারকানাথ সোজাসুজি বলেছেন। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তখন বহু অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল চারদিকে। অত্যাচারও যে তারা করছিল না তাও নয়। অত্যাচার না করে কে কবে মুনাফা লুটেছে, সিন্দুক ভরেছে, ধনী হয়েছে! জীবে-দয়া-নামে-রুচি-র পন্থা ধরে তো জেব-এর উপর দয়া করা যায় না, বজত-কুচিতেও রুচি তৈরি করা যায় না। অগত্যা নীলকর সাহেবেরা যে 'মহাজন যেন গত স হি পন্থা' এই মহামন্ত্র জপতে জপতে চাষীদের জিভ বার করে দেবে তাদের বুট জুতোর চাপে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? জমিদারদের নাগরা জুতোর জায়গায় নীলকর সাহেবদের বুট জুতো চাষীর বুকে মুখে পিঠে লাঞ্ছনাচিহ্ন আঁকছিল এই যা তফাত। তাই তফাত ঘটল

শুধু উপাদানের, লীলার নয়! তবে এটাও জানা ভালো যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে ফেনিয়ে দেশের লোকদের কাছে ধরে দিয়ে চাষীদের উপর অত্যাচার করবার তাদের যে একচেটিয়া অধিকার তারা এতদিন নির্বিবাদে ভোগ করে আসছিল সেটি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ছিল জমিদারেরা। এর প্রমাণ আমরা যথাস্থানে দেখব। তাছাড়া আর-একটা জরুরী জিনিস, মূল্যবান তথ্য যেটা নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী দিয়ে ঢাকা দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে আর যেটা দ্বারকানাথের সত্যনিষ্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে পারলুম সেটি হচ্ছে এই যে নীল-চাষের ফলে গাঁয়ের চাষী আর মধ্যবিত্ত দুই-ই লাভবান হয়েছিল। চাষীরা জমিদারদের কাজ করে একটি পয়সাও পেত না, তাদের বেগার খাটিয়ে নিত জমিদারেরা। নীলকর সাহেবদের নীলকুঠির ক্ষেতে কাজ করে সেই চাষীরাই মাসে প্রায় চার টাকা রোজগার করত। একশো ত্রিশ বৎসর আগে চার টাকার যে কি মূল্য ছিল তা সে দিনের বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের তথ্য যাঁদের জানা নেই তাঁদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে চার টাকায় সে দিন একটি ছোট্ট পরিবারের ডাল ভাতটা চলে যেত। এই তো গেল চাষীদের কথা। গাঁয়ের মধ্যবিত্তদেরও কম উপকার হয় নি নীলকুঠির কৃপায়। কেরানীর কাজ, নায়েবের কাজ, সরকারের কাজ, কত রকমের কাজ তারা পেত নীলকুঠিতে। জমিদারদের শিকারগুলো এমনি করে সে দিন হাত-ছাড়া হয়ে গেল এটা কি কখনো সহ্য হয় জমিদারদের? তাই চাষীদের দুঃখে জমিদারদের প্রাণ এত বিগলিত, নীলকর সাহেবদের হাত থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্যে জমিদারদের এত আকুলতা! দ্বারকানাথ অপূর্ব সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে জমিদারদের এই চাষী-প্রীতির মর্ম আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিতার তারিফ না করে পারা যায় না। তাঁর বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বুঝেছিলেন যে যদি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার রদ করে দিয়ে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্য করবার ও কৃষিকার্য করবার অধিকার দেওয়া যায় তাহলে বহু নতুন বাণিজ্যের সূত্রপাত হবে,

বাণিজ্যের জন্যে নতুন নতুন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ শুরু হবে, দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে যাত্রা শুরু করবে। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এই ছিল একমাত্র পথ। নতুন নতুন ব্যবসা পত্তন করে ও নতুন নতুন কাঁচা মাল তৈরি উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙ্গে বান আনতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বাঁধ ভেঙ্গে ইয়োরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া ছাড়া সে দিনের বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় আর-কোনো পথ ছিল না। একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, অন্য দিকে দেশীয় জমিদারের দল, এই দুই বাঁধের দৌরাত্ম্যে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের স্রোত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মরে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন দ্বারকানাথ সেটা বুঝেছিলেন, তাই তিনি বাণিজ্য ও কৃষির জন্যে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে এসে বসবাসের সমর্থক ছিলেন। তিনি জানতেন যে সেই নতুন সূত্রপাতের পথ আরামের পথ নয়। অনেক মানুষের সুখসুবিধেকে উপেক্ষা করে ইতিহাস তার চলার পথ রচনা করে। চাষীরা স্বভাবতই গতানুতিক-পন্থী, মান্ধাতার আদরের সন্তান তারা। পুরোনো জানা পথ ছাড়া তাদের কাছে আর-কোনো পথ নেই। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সে দিন চাষীদের যে অভিযোগ তার অনেকখানিই ছিল অনভ্যস্ত নীল-চাষ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংস্কারবদ্ধ চাষীদের আপত্তি ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার গতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টির সৌভাগ্যবঞ্চিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বুদ্ধিহীন হৈচৈ। গ্রামের সেই অ-নড় জীবনকে নাড়িয়ে দিতে গেলে জোরে ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে ঝড়ের প্রয়োজন সেখানে দখিনে বাতাসকে বরাদ্দ দিলে চলে কি? দ্বারকানাথ সেটা বুঝতেন, তাই তিনি বলেছিলেন—'এ দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ভারতের ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এবং ইয়োরোপীয়দের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তিরা যা করছেন সেই প্রচেষ্টার যারা বিরুদ্ধতা করতে চায় এবং এ দেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাসে যারা বাধা দিতে চায়, অবিশ্যি সেই বসবাস দেশের বিচার-পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ, তারা বর্তমান দেশবাসীদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু।'

দ্বারকানাথের বিবৃতি থেকে এটাও স্পষ্ট যে তিনি এ দেশে ইয়োরোপীয়দের

বিনা সর্তে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে আরো সুনির্দিষ্ট মত পোষণ করতেন। যথাসময়ে তার আলোচনা করা যাবে।

ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাস ব্যাপার নিয়ে তখন যে আলোচনা চলছিল আর নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তখন যে আন্দোলন চলছিল কলকাতার পত্রিকাগুলিতে তার হদিশ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের 'বঙ্গদূত'-পত্রিকায় এই মন্তব্যটি থেকে পাই—'কস্যশ্চিৎ প্রজায়া ইত্যঙ্কিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যকার দূতপত্রে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু পত্রপ্রেরক ক্লোনিজেসিয়ন বিষয়োপলক্ষ করিয়া বর্তমান নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি যে যে দোষোল্লেখ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিদ্বক্তব্যের আবশ্যক হইল কেন না এরূপ মিথ্যা দোষ তাবৎ নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি দেওয়া অনুচিত বরং এ স্থলে লেখকের অতি কর্তব্য ব্যক্তিপ্রভেদ করিয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের প্রতি একবাক্য দ্বারা অন্যায় করা যুক্তিবিরুদ্ধ কিন্তু মফঃসলে সাহেবলোকেরদিগের নীলের কুঠী হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন হইবায় তালুকদারদিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহারা অন্যান্য বিষয় কর্ম করিতে অক্ষম তাঁহারা কুঠীতে চাকরী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন পরন্তু প্রজাগণের পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রা উপার্জনে যাহারা অক্ষম ছিল তাহারা নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছে এবং মজুরলোকদিগের এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্বে যাহারা সমস্ত দিবা শ্রম করিয়া তিন পণ কড়ি উপার্জন করিতে পারে নাই তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্যন্ত আহরণ করিতেছে। অতএব কহি ইঙ্গরেজলোকে এ প্রদেশে বাহুল্যরূপে কৃষিকর্ম করিলে উত্তরোত্তর প্রজারদিগের আরো উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।'

বাদানুবাদের ঘুর্ণি হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে বাংলাদেশের দিনগুলি এমনিভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মুঠো তখনও শিথিল হয় নি। মুঠো ফুটো করবার জন্যে ইংলণ্ডে ও ভারতে নানা শক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছিল, কিন্তু তখনো সে প্রচেষ্টাগুলি চূর্ণ হয়ে

যাচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দুর্গপ্রাচীরে ধাক্কা মেরে। বাংলাদেশের জনসাধারণের সে দিন না-ছিল অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে কি প্রয়োজন তার জ্ঞান, না-ছিল কণামাত্র রাজনৈতিক চেতনা। রামমোহন, দ্বারকানাথ আর তাঁদের বন্ধু ও সহকর্মী আরো দু-একজন—এই ছিল সারা বাংলা-দেশের মধ্যে চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হিসেব। তাই বাংলাদেশের জনসাধারণের ধাক্কায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক দুর্গের তোরণ ধূলিসাৎ করবার কোনো সম্ভাবনাই তখন ছিল না। যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল বাংলার সেই জমিদারেরা তারা তো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে বাংলাদেশকে তাদের একচেটিয়া দখলে বেখেছিল—বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার আর কৃষির ক্ষেত্রে জমিদারদের একচেটিয়া অধিকাব। তাই জমিদারদের তরফ থেকে কোনো আন্দোলন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বিরুদ্ধে, আশা করবার কোনোই ঐতিহাসিক হেতু আমাদের নেই। সে দিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে আঘাত হানবার, তার একচেটিয়া অধিকারের তলা ফুটো কবে দেবার একমাত্র শক্তি ছিল—ইংরেজ বণিকরা। তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অধিকাবের উপর আঘাত হানবে, এই ছিল ইতিহাসেব নির্দেশ সেই যুগে। তাই বাংলাব তথা ভারতেব অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে সেখানে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভাবনা ঘটাবে ইংলণ্ড—এই ছিল সে যুগের ইতিহাসের নির্দেশ। ইতিহাসের সেই নির্দেশ বুঝেছিলেন রামমোহন আব দ্বারকানাথ। তাই তাঁবা নির্দিষ্ট সর্তানুসারে ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। তবে সবাই রামমোহনেব ও দ্বারকানাথের উদ্দেশ্য ধরতে পারবে ও বুঝতে পারবে এটা আশা করা অন্যায়। বেশির ভাগ লোকই হচ্ছে নাক-বরাবর-দেখনদার—সে দিনও, আজও।

দ্বারকানাথের এই বিবৃতির প্রায় এক বৎসর পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কলকাতা সহরের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করতে দেওয়া হক এই মর্মে গভর্মেণ্টের কাছে একটি মেমোরিয়াল পেশ করলেন। তার কুড়ি দিন পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স-কৌন্সিল গভর্নর-জেনারেল্ যেসব বাধাব

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ব্যবসায়ীরা তাদের মেমোরিয়ালে সেগুলি দূর করবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ব্যবসায়ীদের মেমোরিয়াল আর স-কৌন্‌সিল গভর্নর-জেনারেলের এই প্রস্তাব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল কম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের কাছে। ধর্মসভার নেতৃবৃন্দ কি চুপ থাকতে পারেন যখন রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে ইংরেজের বসবাস সমর্থন করেছেন! কিভাবে রামমোহন ও দ্বারকানাথ সমর্থন করেছেন, কি তাঁরা বলেছেন, কি সর্ত তাঁরা দিয়েছেন সেগুলি বিচার করে দেখবার প্রয়োজনও তাঁরা দেখলেন না। যা রামমোহন আর দ্বারকানাথ বলবেন বা করবেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে হবেই—এই ছিল ধর্মসভার নেতাদের মুখ্য ধর্ম। তাছাড়া এই নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, যাঁদের দৃষ্টি শাস্ত্র আর স্বার্থ এই দুই দেয়ালের বাইরে কখনো যায় নি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কলকাতাবাসী ইয়োরোপীয়েরা গভর্মেণ্টের কাছে এ দেশে বসবাস দাবী করে মেমোরিয়াল দিয়েছেন এই খবর এঁদের বিচলিত করে তুলল। তার উপর স-কৌন্‌সিল গভর্নর-জেনারেল্ এই ইয়োরোপীয়দের দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ তাঁদের স্বার্থের বোঝার উপর শাকের আঁটি হল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এঁরা পার্লামেণ্টের কাছে নিম্ন-উদ্ধৃত আবেদন পেশ করলেন—

মাননীয় গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টে সমবেত কমন্‌স্ সমীপে

বঙ্গের জমিদার ও তালুকদারগণের বিনীত নিবেদন

দরখাস্তকারিগণ এ কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত যে কলকাতার ব্রিটিশ অধিবাসীরা আপনাদের নিকট এই মর্মে আবেদন করেছেন যে ব্রিটিশ প্রজার ভারতে বসবাস সম্পর্কে সমস্ত বাধানিষেধ বন্ধ করা হক। তদ্দরুন দরখাস্তকারিগণ আপনাদের বিবেচনার জন্য তাঁদের নালিশ পার্লামেণ্ট-সমক্ষে উপস্থিত করছে।

দরখাস্তকারিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে বিনীত নিবেদন জানাচ্ছে যে যদি ইয়োরোপীয়দিগকে (যাঁরা এদেশীয় আদালতের বিচারাধীন নন) কোনো বাধানিষেধ ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানে বসবাস করতে দেওয়া হয় তবে তাঁরা

দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিপন্ন করে তুলবেন। এই কারণেই ভারতের স্থানীয় সরকার ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩৮ নং রেগুলেশন মঞ্জুর করেন। তাতে নির্দেশিত আছে সপার্ষদ গবর্নর-জেনারেলের সমর্থন ব্যতীত কোনো জাতির ইয়োরোপীয়ই কলকাতা নগরের বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনো জমি ক্রয় করতে বা ভাড়া করতে বা দখল করতে পারবেন না। সরকারের পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বেও অনুমতি ব্যতিরেকে যাঁরা জমির মালিকানা ভোগ করছেন কিংবা যাঁরা অতঃপর জমি ক্রয় করবেন বা ভাড়া নেবেন সপার্ষদ গভর্নর-জেনারেলের বিচার অনুযায়ী তাঁদের জমি থেকে বহিষ্কৃত করা হবে এবং দালান কোঠা নির্মাণের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

যেসব জেলায় নীলকররা বা অন্যান্য লোকেরা নিজেদের বাসস্থান স্থাপন করেছেন সেখানে জনসাধারণ অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কেন-না নীলকররা বলপূর্বক ঐসব জমি দখল করছেন এবং ধানগাছ নষ্ট কবে নীল চাষ করছেন (ধানের উৎপাদন কমে যাওয়াব এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিষের অভাবের তা-ই কারণ)। তাঁরা গবাদি পশু আটক রাখেন এবং দরিদ্রদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় করেন। দরিদ্রদের নালিশের দরুনই সরকার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন ৬ প্রণয়ন কবেছেন। 'যদি তাঁদের এখানকার জমিদারির বা ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে বসবার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে এ দেশেব জমিদার ও রায়ত সমূলে ধ্বংস হবে!' (কোটেশন—লেখক)।

ভারতের অধিবাসী বিশেষ করে যাঁদের পদমর্যাদা আছে বা যাঁরা উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত তাঁরা ধর্ম বা গোষ্ঠীর প্রচলিত নিয়মে কর্মের জন্য পৃথিবীর অন্য জায়গায় যেতে পারেন না এবং কোনো হীন কাজ বা ব্যবসা করতে সক্ষম নন—পদমর্যাদা রক্ষা করবার বা দেশে জীবিকা অর্জন করবার উপায় তাঁদের নেই--তাঁদের জন্য যে একমাত্র দেওয়ানী-পদ ছিল তা-ও তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে ভূসম্পত্তি ব্যতীত তাঁদের জীবিকার্জনের অন্য কোনো পথ নেই—তাও সরকারের কতগুলো আইন জারীর ফলে, যেমন ১৮১৮-র ১, ১৮১৯-এর ২ এবং ১৮২৫-এর ১১, সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

এই অবস্থায় যদি তাঁদের জমিদারী (যা বকেয়া খাজনার জন্য প্রকাশ্য-ভাবে নিলাম হতে পারে) বিদেশী-দ্বারা ক্রয় করতে দেওয়া হয় তবে জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে এবং পদমর্যাদা রক্ষার্থে তাঁদের অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করতে হবে।

অতএব দরখাস্তকারিগণ বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে পার্লামেণ্টের সুবিদিত সুবিচার যেন অনুগ্রহপূর্বক এ দিকে দৃষ্টি দেন এবং উপরে বর্ণিত ব্রিটিশ প্রজাদের দরখাস্ত নাকচ করেন যে দরখাস্ত এই আবেদনকারীদের স্বার্থ এবং ব্রিটিশ ভারতের সম্পদ ক্ষুণ্ণ করবে। পার্লামেণ্ট যা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তেমন অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা যেন তাঁদের জন্যে করা হয়।

এই দরখাস্তের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে নীলকর সাহেবরা গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে জমি নিয়ে চাষবাস শুরু করেছে সেখানেই চাষীদের উপর অত্যাচার চলেছে, তাদের ধানের জমি জোর করে দখল করে নীলের চাষ করছে নীলকর সাহেবরা, চাষীদের গরু ছিনচ্ছে, গরু আটকে রেখে পয়সা নিচ্ছে, আর তার ফলে চালের উৎপাদন কমে গেছে ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেছে। তাই গভর্মেণ্ট যদি ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করবার অনুমতি দেন তাহলে চাষীর আর জমিদারের দুর্গতির শেষ থাকবে না। অতএব পার্লামেণ্ট যেন এ অনুমতি না দেন।

আগেই বলেছি যে নীলকর সাহেবরা ঠিক বোষ্টমী রীতিতে চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করছিল তা কোনো মতেই বলা চলে না। তবে জমিদারেরাও যে বৈষ্ণবরীতিতে চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন ইতিহাস অন্ততপক্ষে সে সাক্ষ্য দেয় না, আর সেকালের একজন বড় জমিদার—দ্বারকানাথ ঠাকুর—তিনিও তাঁর বিবৃতিতে জমিদারদের দুষ্কর্মগুলি ঠিক বৈষ্ণবজনোচিত বলে ব্যাখ্যা করেন নি। আর নীলকর সাহেবেরা যে সব যুধিষ্ঠিরের সগোত্র এ কথাও রামমোহন কি দ্বারকানাথ কোথাও বলেন নি। নীলকর সাহেবেরা চাষীর জমি ছিনিয়েছে বৈকি—কিন্তু সে মহৎ কাজ তো জমিদারেরা বরাবরই করে এসেছে। নীলকর সাহেবেরা চাষীদের মারধোরও করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারেও তো তারা গাঁয়ের জমিদার আর তার নায়েব, আমলা, বরকন্দাজের চেলাগিরিই করেছে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু জমিদারেরা যেখানে চাষীদের বেগার খাটাত অর্থাৎ তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পয়সা

দিত না সেখানে যে নীলকর সাহেবরা চাষীদের মজুরি দিত, হাজার হাজার গরীব চাষী যে নীলকর সাহেবদের কুঠিতে জন-মজুরি করে এমন মজুরি পেত যা তারা কখনো পায় নি ইতিপূর্বে, গাঁয়ের গরীব মধ্যবিত্তেরাও যে নীলকুঠিতে কাজ করে বেশ দু পয়সা রোজগার করছিল—এসব কথা বেমালুম চাপা দেওয়া হল। যেসব জায়গায় নীলের চাষ হচ্ছিল সেখানকার চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা যে অন্য জায়গার চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থার চেয়ে অনেক ভালো ছিল এটা নিঃসন্দেহ। জমিদারদের ভয়টা ছিল ঠিক এইখানেই। মজুরি নিয়ে কাজ করতে শিখলে চাষীরা আর তাদের কথা শুনবে না, মুখ বুজে বেগার খাটবে না। এ মর্মান্তিক সম্ভাবনা কি জমিদারদের ব্যথা না দিয়ে পারে! তাই জমিদারেরা বিচলিত, চাষীদের দুঃখে এত বিগলিত!

জমিদারেরা সে দিন কিন্তু নিঃসঙ্গ সহায়হীন ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থক ও অবাধ বাণিজ্যনীতির ঘোর দুশমন 'জন্ বুল্'-পত্রিকা জমিদারদের সমর্থনে পঞ্চমুখ হয়ে এগিয়ে এল। জমিদারেরা এল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এল গ্রামাঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাসের বিরুদ্ধে, জমিদারদের একচেটিয়া চাষী-লুণ্ঠনের সমর্থনে। 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশই করে দিল যে হাড়-পাকা রক্ষণশীল রেভারেণ্ড ডক্টর ব্রাইশ জমিদারদের এই দরখাস্তের প্রেরণা যুগিয়েছেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখের হরকরাতে একটি চিঠি ছাপা হল তাতে পত্রপ্রেরক লিখেছেন—

> অনেক বিজ্ঞ ভারতবাসী রেভারেণ্ড—এর পরামর্শে পূর্বের আবেদন-পত্রের প্রতিবাদে আরেকটি আবেদনপত্র পেশ করবেন মনস্থ করেছেন এবং এই পাল্টা আবেদনখানি এই রেভারেণ্ড ভদ্রলোকের হাতে আছে।

ডক্টর ব্রাইশ আর 'জন্ বুল্' এত বেশি চেঁচামেচি করে এর প্রতিবাদ করতে লাগলেন যে সকলেই বুঝলেন যে হরকরা-র অভিযোগটা সত্য। জমিদারদের দরখাস্তের সমর্থনে 'জন্ বুল্' বার বার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখল ও নানা চিঠি ছাপল। সেইসব চিঠিগুলি থেকে বাছাই করে

একটি পাকা হাতের লেখা জোরালো ও রসালো চিঠি পাঠকদের সামনে পেশ করি। চিঠিটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের 'জন্ বুল্'-পত্রিকায় বের হয়েছিল।

চিঠিটি এই,

'জন্ বুল্'-পত্রিকার সম্পাদক সমীপে—

প্রিয় বুল্,

কলকাতার উদারনৈতিকরা যে-কোনো বিষয়েই হাত দেন না কেন সে সম্বন্ধে এমন অজ্ঞতা ও আত্মসমাহিতি তাঁরা জাহির করেন যে যাতে যার সে বিষয়ের সঠিক অবস্থা কিছু জানা আছে তার পক্ষে তা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। গত ১১ তারিখ সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে গেজেটের সম্পাদক 'নীল'দের পক্ষ সমর্থন করে এবং মফঃস্বলের অবস্থা বর্ণনা করে যা যা লিখেছেন তা যে-কেউ মারহাট্টা গড়ের অপর পারে গেছেন—কিংবা আরো দূরে মফঃস্বলে টিটাগড় কি ব্যারাকপুর গেছেন, তিনি বিদ্রূপের হাসি হাসবেন এবং আমার বিশ্বাস নীলকররা এই প্রবন্ধ যত বেশি উপভোগ করবেন এমনটি আর কেউ উপভোগ করবেন না। প্রিয় বুল্, এককথায় এই প্রবন্ধটি বিলকুল ভুয়া—আগাগোড়া অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রথমত, "নীলকররা সরকারের সন্দেহের পাত্র !!!" দ্বিতীয়ত, "সমাজ নীলকরদের অত্যাচারী মনে করে!" তৃতীয়ত, "তাঁরা অত্যাচার করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই !!" চতুর্থত, "নীলকর কারণ ব্যতিরেকে হয়তো কখনো কখনো কুলিকে বেত্রাঘাত করে থাকতে পারেন !!!" পঞ্চমত, "আমরা অত্যাচারের প্রমাণ দাবী করি।" ষষ্ঠত, "গোলমালে নীলকরদের দোষ নামমাত্র।" সপ্তমত, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অজ্ঞাতে নীলকরদের গোলমালের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়!" অষ্টমত, "একটা সাধারণ মামলার নিষ্পত্তির আগে মাস ও অনেক সময় বৎসর ধরে সাক্ষীদের মফঃস্বল আদালতে উপস্থিত হতে হয় !!!" নবমত, "নীলকররা না থাকলে জমিদারদের জমিদারী বিক্রয় হয়ে যেত। অথবা সরকারের হাতে চলে যেত।" দুটি স্তম্ভ বিষয়বস্তুর এখান থেকে ওখান থেকে উপরে

উদ্ধৃত যে নয়টি বাক্য নেওয়া হয়েছে তার থেকেই দেখা যাবে যে লেখক যিনিই হোন না কেন তাঁর অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রচুর। প্রমাণ: প্রথমত, কখন নীলকররা সরকারের সন্দেহভাজন হয়েছেন? কখনো না। দ্বিতীয়ত, কে বলে নীলকররা সবাই অত্যাচারী? কেউ না। তৃতীয়ত, "তাঁরা অত্যাচার করেন তা প্রমাণিত হয় নি।" এ কথা সত্য নয়! আমি সাম্প্রতিক ঘটনার কোনো উদাহরণ গ্রহণ করব না, কিন্তু পার্লামেণ্টের মুদ্রিত কাগজপত্র থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। সেখানে দেখছি সারুন জেলার জনৈক মি. ডগলাসের অগ্নিসংযোগের অপরাধে সুপ্রীম কোর্টদ্বারা ১২ মাসের কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা হয়েছে—দেখছি একজন রায়তকে হত্যা করার অপরাধে পূর্ণিয়া জেলার জনৈক মি. ক্লার্কের ১২ মাস কারাদণ্ড ও ৪০০ টাকা জরিমানা হয়েছে। আমি দেখছি জনৈক ফিচ্‌বার্নের নরহত্যার অপরাধে—একজন গোমস্তাকে হত্যা করার জন্যে ৪০০ টাকা জরিমানা ও ১২ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। সেই একই ফিচ্‌বার্নের একজন এদেশবাসীকে মারপিট করার অপরাধে ১০০ টাকা জরিমানা ও ১২ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদকের প্রতিবাদে আমি বলি তাঁরা যে অত্যাচার করেছেন তা প্রমাণিত। চতুর্থত, "যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে একজন কুলীকে বেত মারা যায়।" আমার বিশ্বাস অন্যান্য মানুষের মতই কুলীদেরও অনুভূতি আছে এবং আমি ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদককে ধন্যবাদ দেব যদি আমাকে জানিয়ে দেন যে কোন্ কারণকে তিনি যথেষ্ট কারণ বলে মনে করেন যে-কারণের বলে একজন নীলকর এমনকি একজন কুলীকেও বেত মারবার অধিকার লাভ করেন। পঞ্চমত, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি এবং উপরে তাঁদের অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা দেখিয়েছি। ষষ্ঠত, "গণ্ডগোলে নীলকরদের অংশগ্রহণ নাম মাত্র।" নীলকররা সম্পাদককে জানিয়ে দিতে পারবেন যে অকারণে গোলমালে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে গোলমাল এড়ানোর মত বুদ্ধি তাঁদের আছে—

"ঝগড়ায় যে বাধা দেয়"
"রক্তাক্ত নাক তাকে মুছতেই হবে।"

সপ্তমত, "জমিদার নীলকরের হয়ে জমিতে বীজ বপন করেন।"

এটা সত্য হলে নীলকররা খুব খুশি হবেন অনুমান করি। আমার বক্তব্য এই, জমিদাররা নীলকরদের হয়ে প্রায়ই আগাছা কাটেন। "নীলকররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের অজ্ঞাতে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন"—এই উক্তি একেবারে ভুয়া। বেচারীরা! একমাত্র যে উপায়ে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতে গোলমালে জড়িয়ে পড়েন সেই উপায়ের খবর কলিকাতার "সাদাবাবুদের" বইতে পাওয়া যাবে। অষ্টমত, "সাক্ষীদের বৎসরব্যাপী হাজরি দিতে হয় কোর্টে" বৎসর কেন, শতাব্দী ধরে! বঙ্গলিপুরে একজন সাক্ষী আছেন—তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে সেখানে—এখন পর্যন্ত সে বেচারীকে জেরা করা হয় নি। নবমত, "নীলকররা সরকারের সব খাজনা দিয়ে থাকেন।" কী সহৃদয় ব্যক্তি সব! গড়ে প্রত্যেক জেলায় ভারতব্যাপী তিন জন নীলকব আছেন এবং এই খোসমেজাজী ব্যক্তিরা সরকারকে রক্ষা করেন, এবং সরকারকে চালু রাখতে প্রত্যেক বছর বাইশ কোটি, তেইশ কোটি টাকা দিয়ে থাকেন। কলকাতার 'উদারনৈতিক শ্বেতাঙ্গ বাবুরা' তাঁদের এ টাকা সরবরাহ করেন। গভর্মেণ্টের লোকদের সঙ্গে এঁদের খুবই দহরম-মহরম। এমন আবোল-তাবোল, এমন ভুয়া কথা পৃথিবীতে কখনো কেউ শুনেছে? তার পরেই আবার 'ব্রিটিশ কৌশল', 'ব্রিটিশ মূলধন', 'ব্রিটিশ শিল্প'-এর বুকনি। 'ব্রিটিশ কৌশল'? সেটা কী বস্তু? এ দেশবাসীকে কৌশলে ঠকিয়ে যাতে টাকা নেওয়া যায় তারই নাম 'ব্রিটিশ কৌশল।' 'ব্রিটিশ মূলধন' কী? কেন, একটিও টাকা না নিয়ে ভারতে এসে একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং বেপরোয়া-ভাবে ধার করা। 'ব্রিটিশ শিল্প' কী? কেন, সবচেয়ে সেরা গৃহে বাস করা, লাল সরাব এবং সিমকিন পান এবং বেচারী নীলদের নিকট উদ্ধত চিঠি লেখা—তারই নাম 'ব্রিটিশ শিল্প'।

আপনার অনুগত
ভেরিটাস।

চিঠিটা খুবই উপভোগ করবার জিনিস। লেখকের মুন্সিয়ানা আছে। নীলকর সাহেবদের পিঠে চাবুক মেরে নুন ছিটিয়ে দেওয়ার কায়দাটাও খুব জবর। চিঠিটা থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে যে একই জাতির লোকদের মধ্যে

যখন অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ শুরু হয় তখন ন্যাশানালিজমের সব বাঁধন আলগা হয়ে যায়। তখন একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থক রক্ষণশীল ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থক উদারনৈতিক ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধা করে না। শুধু তাই নয়, তখন দল ভারী করবার মতলবে কালা আদমীর সঙ্গে জোট বাঁধতেও বাধে না। তাই তো লোকে বলে যে যাদের পকেটগুলো একসুরে বাঁধা যখনই তাদের স্বার্থে ঘা পড়ে তখনই জাতীয়তার দোহাই, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধুর কাহিনী কিছুই তাদের মনের উপর বিন্দুমাত্র দাগ দেয় না, স্বার্থের তৈলসিক্ত মন থেকে সব পিছলিয়ে যায়। তখন জাতীয়তার বেড়া টপকে, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় মুখোস ফেলে দিয়ে এক-পকেটধর্মীরা সব এক হয়ে যায়—কালা, ধলা, পীত, সব এক হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একেই বলা হয়—শ্রেণীস্বার্থ হচ্ছে জাতীয়তার তলা-ফুটো-করনেওয়ালা। যাই হক, শিক্ষিত ও সংস্কৃতদের কোমল হৃদয়ে আর অকারণ ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। ইতিহাস এমনিতেই এত ব্যথা দেয় শিক্ষিতদের, যে তার পরে বিজ্ঞানসম্ভূতা ব্যথা দেওয়া নিষ্ঠুরতার সামিল হবে।

জমিদারদের এই দরখাস্ত 'জন্ বুল্'-পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার কিছু কাল পরে নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হল—

'জন্ বুল্'-পত্রিকাব সম্পাদক সমীপে

মহাশয়,

গত ২৫ তারিখের আপনার পত্রিকায় ইংরেজদের এ দেশে বাসের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের কাছে কলকাতার জমিদার তালুকদাব ও প্রতিপত্তিশালী এদেশবাসীর একটি আবেদনপত্র ছেপে আপনি আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। যদিও তা এদেশবাসীর ও ইয়োরোপীয়দের প্রতি ফলপ্রসূ হবে কি-না সন্দেহ—যদি তা বাধা দেওয়া হয় তাহলে দেশীয় ভদ্রলোকরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তার চাইতে জোর বিবৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই আবেদনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"যেসব জেলায় নীলকর এবং অন্যান্যেরা বসবাস করতে শুরু করেছে, দেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেসব জায়গায় জনগণ বেশি অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে কারণ নীলকররা বলপূর্বক জমি অধিকার করে

বসছেন, 'ধানের চারা নষ্ট করে নীল চাষ করছেন (এজন্যেই ধানের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব হচ্ছে)। তাঁরা গবাদি পশু আটকে রাখছেন, দরিদ্র জনসাধারণ থেকে টাকা আদায় করছেন। এই দরিদ্রদের অভিযোগেই ভারত সরকার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ রেগুলেশন জারি করেন। যদি তাঁদের এ দেশে জমিদারী বা ভূসম্পত্তি রাখতে দেওয়া হয় তবে দেশের জমিদার এবং তাঁদের রায়তরা অনিবার্য-ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবেন।'

যদি ধরে নেওয়া যায় যে এদেশবাসী নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে তা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে নয়। কারণ যারাই চাষবাস সম্বন্ধে কিছু বোঝে তারা জানে যে—'ধান-জমিতে নীল-চাষ হয় না। কাজেই এ দেশের ভদ্রলোকেরা চালের যে অভাবের কথা বর্ণনা করেছেন সেই অভাব যদি সত্যি হয় তো তাহলে সেই অভাব যে নীল-করদের অত্যাচারের দরুন নয়, দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্যে ঘটেছে সেটা জানা ভালো।

আশ্চর্যের কথা এই যে নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে এ দেশের লোকদের বাঁচাবার জন্যে এ দেশের লোকদের গভর্মেণ্টের আশ্রয় দরকার—এর প্রমাণ হিসেবে ১৮২৩ সালের রেগুলেশন ৬-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে রায়তদের দুমুখো শঠতার হাত থেকে নীলকরদের বাঁচাবার জন্যেই এই রেগুলেশনের সৃষ্টি। এই রেগুলেশনে নীলকরদের অধিকার দেওয়া হয়েছে ক্ষেতের ফসলে এবং চাষীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবার কতকগুলি সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে যেগুলি আগে ছিল না।

এ কথা সবাই জানে যে যেখানে যেখানে নীলকররা বসবাস করছেন সেখানে গত পনেরো বছরের মধ্যে মজুরদের মজুরি দ্বিগুণ হয়েছে ও জমির খাজনাও সে অনুপাতে বেড়েছে। রাষ্ট্রের কিংবা প্রজাদের দারিদ্র্য বেড়ে যাচ্ছে—এর প্রমাণ যদি থেকে থাকে তাহলে অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁরা আমাদের জ্ঞান দিতে চান, বলতেই হবে যে তাঁদের নজরে সেই প্রমাণগুলি পড়ে নি।

জঙ্গল বারু, ৩রা অগস্ট, ১৮২৮ বেন ব্লক, আই.পি.

এই চিঠিটির তলায় 'জন্ বুল্'-এর সম্পাদক এই মন্তব্যটুকু জুড়ে দিয়েছেন—

সংবাদদাতা আমাদের যতটা বেকুফ মনে করেছেন আমরা ঠিক ততটা গ্রাম্য নই। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া প্রমাণ থেকে জানি যে নীল-করদের সেই কর্মচারীটি যার মার খাওয়ার কথা খবরের কাগজে এত ফলাও করে বের করা হয়েছে কিছুদিন আগে, তাকে ভুল করে জনৈক নীলকর ভেবে মেরেছে। দরখাস্তে যেসব অভিযোগ জানান হয়েছে এই নীলকরটি সেই কাজগুলিই করেছে। সে ধানজমি দখল করে নীলের চাষ করেছে। এ বিষয়ে 'বিশপ হেবার'-এর পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'জন্ বুল্'-পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার বনাম অবাধ-বাণিজ্য—এই বিষয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছেঃ

কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে ইংরেজ শিল্পোৎপাদকেরা কী লাভ করবে সে সম্বন্ধে অধুনা অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। বিরাট বাজারে তারা শিল্পজাত মাল ছড়িয়ে দিতে পারবে এই চতুর যুক্তি বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকার-বিরোধীরা সর্বদাই ব্যবহার করছে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে। এখন দেশীয় উৎপাদকেরা কি হারাবে তা বিবেচনা করে দেখা যাক। এ সমস্যা বর্তমান সময়েও নিছক নীতিগত সমস্যা নয়। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ অল্প বাড়লেও এ দেশের উৎপাদকদের পক্ষে এই বৃদ্ধি সর্বনাশের কারণ হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে ভারতে যে মাল সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তা হচ্ছে সুতোর তৈরী মাল। এ দেশের চাহিদা এই একটি জিনিসে সীমাবদ্ধ বললেও চলে। ইংলণ্ডের হাতে যন্ত্রপাতি থাকার সুবিধে এই যে এসব জিনিস সেখানে তৈরি হয় এবং কাঁচা মালের বীমা ও ভাড়া খরচ এবং পরে তৈরী মালের জন্যে বীমা ও ভাড়া খরচ দিয়েও এদেশীয় তাঁতিরা যে দামে তাদের তৈরী কাপড় বিক্রী করতে পারে তার চাইতেও কম দামে এরা কাপড় বিক্রী করতে পারে। আমরা সবাই জানি যে হাজার হাজার তাঁতী জীবিকাচ্যুত হয়েছে এবং এই প্রতি-

দ্বন্দ্বিতার ফলে বিপন্ন হচ্ছে ও দরিদ্র হচ্ছে। ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থকদের মতামত যতটা প্রণিধানযোগ্য এ দেশের তাঁতীদের অবস্থা অন্তত ততটা প্রণিধানযোগ্য মনে করে আমরা কি এই তাঁতীদের অবস্থার কথা সকলের কাছে তুলে ধরতে পারি নে?

কি ভালোবাসা বাংলার তাঁতীদের উপর! 'জন্ বুল্' স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে বিলিতী কাপড় আমদানি করে বাংলার তাঁতীদের গুঁড়িয়ে দেবার মধুর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে :

> আমরা সবাই জানি যে এই দেশের হাজার হাজার তাঁতি জীবিকাচ্যুত হচ্ছে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপন্ন ও দরিদ্র হচ্ছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই সর্বনাশ কে করেছিল তাঁতীদের? ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দ্বারাই বাংলার তাঁতীদের এই সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। তখন কিন্তু 'জন্ বুল্' সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, একবারও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এই বাণিজ্যনীতির প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু যেই অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন অমনি বাংলার তাঁতীদের দুঃখে 'জন্ বুল'-এর হৃদয় বিগলিত হল। অবাধ-বাণিজ্যনীতি গৃহীত হলে ভারতবর্ষের কি দুর্দশা হবে সেটা ভেবে 'জন্ বুল্' রাতের ঘুম মনের শান্তি সব হারিয়ে বসলেন। এটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু মনে রাখা দরকার যে শ্রেণীস্বার্থের বাষ্পেই অর্থনীতির ও রাজনীতির ইঞ্জিন চলে, আর শ্রেণীস্বার্থকে জাতীয়-কল্যাণপন্থী ও মানব-কল্যাণপন্থী লেবেল দিয়ে চালিয়ে দেবার সুচতুর পদ্ধতি অতি সনাতন বিধি। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে 'জন্ বুল্' জাতে আর ধাতে সনাতনী। বাংলার সনাতনপন্থীদের সঙ্গে 'জন্ বুল্'-এর কণ্ঠিবদলের খবরও আমরা যথাস্থানে দিয়েছি।

কম্পানীর সমর্থক আর-একজন বিখ্যাত লোকের কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস' (*Political History of India*) প্রণয়ন করেছিলেন সর্ জন্ ম্যাল্‌কম্। এঁর মনের ধাঁচার হদিশ ছোট্ট একটি তথ্য থেকেই পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ঘোর বিরুদ্ধতা করেছিলেন সর্ জন্। তাই 'জন্ বুল্'-এর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই লোকটির উপর। 'জন্ বুল্'-এর বহু সংখ্যায়

অবাধ-বাণিজ্যনীতির বিপক্ষতা করতে গিয়ে 'জন্ বুল্' সর্ জন্-এর মত এমন একটি বিখ্যাত লোকও যে তাঁদের দিকে সে কথা পত্রিকা-সম্পাদক বার বার নানা ছাঁদে প্রকাশ করেছেন। এ হেন সর্ জন্ ম্যাল্কম্ তাঁর 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন :

'যদিও একসময়ে বাণিজ্যে একচেটিয়া সুযোগ রক্ষার ইচ্ছায় কম্পানীর সরকারকে ইয়োরোপীয়দের ভারতযাত্রার বিরোধিতা করতে হয়েছে' তথাপি কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ তাদের অনুদার ও ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন নীতির দরুন এ দেশে ইংরেজদের বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন ও বসতি সম্বন্ধে নিষেধ জারি করেছেন—সম্প্রতি 'এইযে অপবাদ কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্‌কে দেওয়া হচ্ছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। বরং যাঁরা বসতি স্থাপন করবেন 'তাঁদের কল্যাণ, দেশীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যের শান্তি ও সম্পদ—এইগুলির দিকে নজর রেখে কোর্ট ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছেন।' (কোটেশন—লেখক)

সর্ জন্-এর জবানি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকদের একদা মুনাফা-রুচি ছিল, ও সেই কারণেই অন্য ইয়োরোপীয়দের সেই মুনাফা-লোটার শুচিক্ষেত্রে ঘেঁসতে দিতে তাঁদের তখন বিলক্ষণ অরুচি ছিল, পরে কিন্তু তাঁরা সেই অরুচিরোগে আর ভোগেন নি। ভারতবাসী-দের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্যেই সেই ইয়োরোপীয়দের যেটুকু বাধা দেওয়া দরকার সেটুকু বাধা তাঁরা দিয়েছেন! এমন উপভোগ্য রসিকতাটুকুর টীকা করে তার রস উবিয়ে দিতে আমি চাই নে।

সে দিন যাঁরা অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তনের ও ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের কি বলবার ছিল সেটি তাঁদেরই সেরা মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। বাংলার জমিদারশ্রেণী আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সে দিন একজোট হয়ে লড়ছে অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ও ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হওয়ার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে। জমিদারেরা লড়ছে, চাষীদের উপর তাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব অটুট রাখবার জন্যে; ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী লড়ছে তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। কায়েমী স্বার্থের দেশী ও বিদেশী ভোগকরনে-

ওয়ালা মালিকেরা তখন 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' মহামন্ত্রের জোরে এক হয়েছে—মুখে তাদের এক বুলি—ভারতবাসীর স্বার্থ ও চাষীর স্বার্থ বিপদাপন্ন।

সমুদ্রপারের অবস্থাটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ইংলণ্ডেও লড়াইটা জমে উঠেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে অন্য ব্যবসায়ীদের ও কলকারখানার মালিকদের।

ভারতবর্ষে ও চীন দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর যে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার ছিল তার বিরুদ্ধে অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিল ইংলণ্ড। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে *A View of the Present State and Future Prospects of the Free Trade and Colonization of India* নামে একটি পুস্তিকা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকার কদর বাইবেলের চেয়ে কম ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে যাতে আবার চার্টর না দেওয়া হয় ভারতবর্ষে একচেটিয়া-ভাবে ব্যবসা করতে তার জন্যে পার্লামেণ্টেও অনেক সদস্য উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরাও এই পুস্তিকা থেকেই তাঁদের যুক্তি যোগাড় করতেন। এই পুস্তিকাটিতে বলা হল যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে—

> ইংলণ্ডের রাজার ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যদুটির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের অবাধ স্বাধীনতা এবং ভারতে ইংরেজদের অবাধ বসতি-স্থাপন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকাতে, এবং অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার থেকে সাধারণ লোক বঞ্চিত হওয়াতে—

> ইংলণ্ডের বাণিজ্যকে বাধা দেবার জন্যে এবং ভারতের উন্নতি খর্ব করবার জন্যে যুক্তি, সাধারণ বোধ এবং বিজ্ঞানের সূত্র সমস্তই তুচ্ছ করা হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারকে ও তাদের ভারত-শাসন-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করে পুস্তিকাকার লিখলেন :

> একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমরা আগেকার পৃষ্ঠায় যেসব দোষের কথা বলেছি তাদের প্রতিকারের জন্যে প্রয়োজন ইয়োরোপীয়দের বসতি

অথবা আরো খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে তাদের প্রতিকারের জন্যে চাই 'ইয়োরোপীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং ইয়োরোপীয় কর্মনিপুণতা, ইয়োরোপীয় শিল্পকর্মপ্রচেষ্টা এবং ইয়োরোপীয় মূলধনের প্রবর্তন এই দেশে।' নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হচ্ছে যুক্তির নমুনা—অবিশ্যি যদি তাদের আমরা যুক্তির নমুনা বলতে পারি—যা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের সমর্থকেরা এর বিরুদ্ধে খাড়া করেন। ভারতীয়রা এক অদ্ভুত, ভীরু জাতি এবং যদি ইয়োরোপীয়রা জমির অধিকার নেন তবে কালক্রমে তাঁরা এদেশবাসীকে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করবেন। একচেটিয়া বাণিজ্যের ধ্বজাধারী ও তাদের ভৃত্যরা ছাড়া ইংরেজ এক নৃশংস জাতি; 'তাঁদের যদি ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মিশতে দেওয়া হয় তবে দেশীয় অধিবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁরা এমন হিংস্র ব্যবহার করবেন যে দেশীয়রা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠবে, মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং মনিবদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। 'যদি ইয়োরোপীয়রা ভারতে বসতি স্থাপন করে তারা তাহলে উপনিবেশ গড়ে তুলবে, তখন গ্রেট ব্রিটেন যেভাবে আমেরিকার উপনিবেশগুলো হারিয়েছে ঠিক সেভাবে ভারতের রাজত্ব হারাবে।' যদি আমরা ভারতীয়দের সভ্য করে তুলি অথবা, অন্য কথায়, যদি তাদের ভালোভাবে শাসন করি তাহলে ভারতীয়রা জ্ঞান ও আলোক পাবে, ফলে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, দেশ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবে এবং স্বদেশীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। এইসব ভয়াবহ ও সর্বনাশা যুক্তির সমর্থক হিসেবে এই ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্নভাবে কিংবা খোলাখুলিভাবে করা হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতীয়দের শাসন করবার সর্বোত্তম যন্ত্রবিশেষ ও প্রকৃতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে ও ভারতীয়দের পরস্পরের জন্যে সৃষ্টি করেছে। তা থেকে এ কথাই আসে যে 'যতদিন না শাসনতন্ত্র বাণিজ্য একচেটিয়া-ভাবে চালাচ্ছে ততদিন ভারত-শাসন করা সম্ভব হবে না।' জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির এবং বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্যগুলির একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের প্রতি ভারতীয়দের অন্তরের টান। তারা লঘু ও বাঁধাধরা খাজনার পরিবর্তে গুরুভার ও সদাই পরিবর্তনশীল খাজনা দিতে ভালোবাসে। উদাহরণত বলা যায় যে এরা কম্পানীকে

বাৎসরিক জমির উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন ভাগ দিতে প্রস্তুত তবু একটা বাঁধাধরা মাঝারি গোছের ভূমিকর দিতে নারাজ। তারা সম্মানের, বিশ্বাসের বা সুবিধার পদ থেকে বঞ্চিত হতে ভালো-বাসে এবং মাননীয় কোম্পানীর বিচারাধীনে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পদ অর্পণ করতে চায়, অল্পকথায়, সব নূতনত্বই তাদের কাছে ঘৃণার বস্তু। তারা পরিবর্তনকে ঘৃণা করে যদিও সে পরিবর্তন পুরোপুরি মন্দ থেকে ভালোর দিকে তাদের নিয়ে যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর এই ধরনের তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভর্তি এই পুস্তিকাটি। নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য বজায় রাখবার জন্যে নানা অদ্ভুত ধরনের যুক্তি দিয়ে অবুঝ লোকদের ভড়কে দেবার চেষ্টা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর তরফ থেকেও কম করা হয় নি। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসবাস করতে দিলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যাবে যেমন করে আমেরিকা ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়েছে—ইংলণ্ডের লোকদের এই ভয় দেখাতে কম্পানী কসুর করে নি সে দিন। কম্পানীর তরফ থেকে পালটা আক্রমণও সেদিন বন্ধ ছিল না। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'এশিয়াটিক জর্নল' একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সমর্থন করে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার 'এশিয়াটিক জর্নল'-এ উপরি-উক্ত পুস্তিকাটির সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় পুস্তিকাটির লেখককে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে :

> তিনি সেই একই রকম নিসংশয়ভাবে দেখাতে চাচ্ছেন যে নীল চাষের যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা ভারতে ব্রিটিশদের বসবাসের সুফলের সন্তোষজনক প্রমাণ। অতি অল্পবুদ্ধি লোকের কাছেও একথা পরিষ্কার যে মজবুত পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের কোনো একটি বিশেষ স্থানে ইয়োরোপীয়দের একটি মাত্র শস্য-উৎপাদনের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যা স্থানীয় সরকারের নজরের উপর ঘটছে, তাকে ভারতে ইয়োরোপীয়দের নির্বিচার বসতিস্থাপনের স্বপক্ষে প্রমাণ কিছুতেই বলা যায় না। এই দুর্বল সমর্থনও তাই বিফল। লেখক তাঁর পাঠকদের বলছেন, 'একটি জেলায় নীলের চাষের সূত্রপাত হচ্ছে শৃঙ্খলা, শান্তি ও সন্তোষের অগ্রদূত।' এবং আগে সৈন্যের সাহায্যে জনসাধারণের কাছ

থেকে খাজনা ইত্যাদি যা আদায় করা হত তা এখন নিয়মিতভাবে আদায় হচ্ছে। তিরহুত জেলায় নীল-চাষ বহুদিনের, 'সেখানে ইংরেজ নীলকর ও ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য এত গভীর যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীও তাকে আদর্শ বলে মনে করেন—যদিও কম্পানী তার যথার্থ কারণ দর্শাতে পারেন না।' সংক্ষেপত, তিনি বলছেন, পরীক্ষাটি 'অবিমিশ্র মঙ্গলের দান।' তাঁর স্বভাবগত বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বিশপ হেবারের লেখা থেকে ইংরেজদের এখানে জমিক্রয় সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি আহরণ করে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। বিশপ হেবারের সুবুদ্ধির এবং স্থানীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত মনের তিনি প্রশংসা করেন। লেখক জানেন (অন্যত্র তিনি তার উল্লেখও করেছেন) যে বিশপ হেবার তাঁর গোপনীয় চিঠিপত্রে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে 'নীলকররা দেশীয়দের সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচবণ কবেন এবং যেসব জেলায় তাঁরা থাকেন সেখানে দেশীয়দের দৃষ্টিতে ইংরেজ চরিত্র নীচু করে দিয়েছেন।' বিশপ একই চিঠিতে স্থানীয় সরকারের হাতে ভারত থেকে কোনো ব্যক্তিকে নির্বাসিত করবার ক্ষমতা অর্পণেব কথা সমর্থন করেছেন, কম্পানীর হাতে নীলকরদের নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা হিসেবে। এবং যে অবধি বসবাস নীতিসম্পর্কে 'ডব্লিউ' পাগল, নীলকরদের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করে সেই নীতির অসারতা দেখিয়েছেন।' যে লেখক পাঠকদের এই এইরকম উদ্ধতভাবে প্রতারিত করে তার সম্বন্ধে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করেছি তার চেয়ে আরো কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত।

এই মন্তব্যটি শুধু উপভোগ্য নয়, নানা কারণে প্রণিধানযোগ্যও। অবাধ-বাণিজের অধিকার যারা দাবী করছিল তারা যে বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকার-ভোগকরনেওয়ালাদের চেয়ে সাত্ত্বিক স্বভাবের লোক ছিল তা তো মনে হয় না। একচেটিয়া-ব্যবসার অধিকারীরা যেমন মুনাফা-লোলুপ, অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-দাবীকরনেওয়ালা বণিকরা ততখানি মুনাফা-লোলুপ। ভারতবর্ষের দুঃখদুর্দশার কাহিনীর কথা লোককে শোনানো উভয়ের ক্ষেত্রেই কপটতা এবং ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে বিনিদ্র রজনী যাপন উভয়ের বেলাতেই নিছক অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। একচেটিয়া-ব্যবসার অধিকারীরা ভারতবর্ষের ও চীনের বাজার এমন শক্ত করে তাদের মুঠোর

মধ্যে ধরে রেখেছিল যে মাথা গলানো দূরে থাকুক কড়ে আঙুলটিও গলানো অসম্ভব ছিল সেই মুঠোয় বাঁধা ভারতের ও চীনের বাজারে। একদল বণিক অসম্ভব মুনাফা লুটছে আর অন্য একদল বণিক হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই মুনাফা-লোটা দেখছে এই দৃশ্য উপভোগ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু এই দৃশ্য শিশিরফোঁটার মতই ক্ষণিকের। বণিকরা মৌনী থাকার সাধনা করে না। খালি জেবের দুঃখে তাদের জিভ অসম্ভব তাড়াতাড়ি নড়তে থাকে। লাভ করবার লোভে তারা মরিয়া হয়ে লেগে পড়ে অন্য বণিকদের মুনাফার ভাগীদার হবার জন্যে, অন্য বণিকদের মুঠোয়-বাঁধা বাজারে নিজেদের ঠাঁই করে নেবার জন্যে। অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবী করছিল যে ইংরেজ বণিকরা তারাও একচেটিয়া-ব্যবসার অধিকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মত নিজেদের পকেট বোঝাই করার মতলবেই ছিল। কিন্তু তাদের অজানিতে তারা ইতিহাসের এগিয়ে-চলার কাজে সহায়তা করছিল। অবাধ-বাণিজ্যনীতি অনুসারে বেবাক বণিকদের পৃথিবীর বাজারে ব্যবসা করবার সুযোগ না দিয়ে ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। তাই মুনাফার মধুর গন্ধে ভারতের বাজারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে-থাকা ইংরেজ বণিকদল একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করছিল—কিন্তু আগেই বলেছি যে সেটা তাদের অভিপ্রেত কাজ ছিল না, সেটা ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থপূরণের by-product।

একচেটিয়া-বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের দাবী-করনে-ওয়ালাদের বাঁও কসাকসি দঙ্গলে নীলকুঠির কথা বার বার উঠেছে। নীলকুঠির মালিকেরা ইংরেজ হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাদের বদনাম করতে ছাড়ে নি। নীলকুঠির সাহেবরা যে সব ভোলানাথ ছিল তা নয়, ভোলানাথের ঝুলির বাসিন্দেদের সঙ্গেই তাদের মিল ছিল বেশী। তাই তাদের কাণ্ডকারখানা যে অনেক সময়ে ভুতুড়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের দোষ দেখাবার জন্যে তাদের মুখে যতটা ছাই মাখাচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, ততটা ছাই মাখাবার যোগ্যতা তাদের ছিল না। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এই নীলকুঠির সাহেবরা যে জাতের জীবই হক না কেন, তারা যে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল এবং অর্থোপার্জনের দিক থেকে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের, ক্ষেত-মজুরদের ও গ্রামের

মধ্যবিত্তদের উন্নতিবিধান করেছিল, সে বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থকেরা একটি কথাও বলেন নি।

অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা অবাধ-বাণিজ্যের সুফল প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। না এঁদের, না ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মাতব্বরদের ইতিহাসের গতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা ছিল, তাই নীলকুঠির সাহেবদের মুখে একদল খড়ি ঘস্‌তে ও অন্য দল কালি মাখাতে ব্যস্ত রইলেন। ইতিহাসের ধারা এই দুই দলেরই পাশ দিয়ে বয়ে গেল। কিন্তু এই ঝগড়ার দৌলতে একটি খবর ফাঁস হয়ে গেল। অবাধ-বাণিজ্যের উপকারিতা প্রমাণ করবার জন্যে অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা বিশপ্‌ হেবর্‌-এর মতের উল্লেখ করেছেন। বিশপ্‌ হেবর্‌ ভারতবর্ষে এসে যা দেখেছিলেন সে-সব লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ জর্নল-এ। সেই জর্নল-এ বিশপ্‌ হেবর্‌ ভারতবর্ষে ইংরেজদের বসবাস সমর্থন করে লিখেছেন যে, "জমি কিনতে ইংরেজদের বাধা না দিয়ে, তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত।" তাঁর জর্নল-এ বিশপ্‌ মহোদয় নীলকুঠির সাহেবদের খুব তারিফও করেছেন। তাই অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা যে বিশপ্‌ হেবর্‌-এর দোহাই দেবেন সে তো অতি স্বাভাবিক। 'এশিয়াটিক জর্নল' এই বিশপ্‌ মহোদয় সম্বন্ধে ভারী রসালো তথ্য যুগিয়েছেন। 'এশিয়াটিক জর্নল'-এর মতে বিশপ্‌ সাহেব তাঁর জর্নল-এ যাকিছু ছাপান না কেন, গোপন চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে নীলকুঠির সাহেবদের কাণ্ডকারখানায় ইংরেজ জাতের মুখে কালি মাখানো হচ্ছে। বিশপ্‌ নাকি এও জানিয়েছিলেন তাঁর গোপন চিঠিতে যে এই নীলকুঠির সাহেবদের ধরে ধরে সাগর পারে চালান করবার অধিকার স্থানীয় গভর্মেণ্টের হাতে থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসবাস করা নিয়ে যে দাবী করা হয়েছিল সেই দাবীকেও তিনি অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বিশপ্‌ হেবরের যে বিশপ্‌ হবার যোগ্যতা ছিল তা তাঁর বাইরে এক রকম আর ভিতরে এক রকম, দু রকম মত একই সময়ে পোষণ করবার ও হাজির করবার অসাধারণ লীলাখেলা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যার 'এশিয়াটিক জর্নল'-এ এই সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে বাছাই করে করে

প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলে দিচ্ছি :—

বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিরোধীরা যেরকম সুসংবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে আমরা তার উল্লেখ করেছি : যদিও তাদের কাজের ফল তাদের সুসংবদ্ধ আক্রমণ-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রমাণ দেয় নি তবুও এই দলের কিছু কিছু লোকের অবিমৃষ্যকারিতা তাদের কর্মপদ্ধতির প্রমাণ দেবে। সম্প্রতি কলকাতার একটি প্রগতিশীল ও অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থক কাগজে আমরা একটি ব্যক্তিগত চিঠি ছাপা হয়েছে দেখি যা সেই শহরেরই কোনো ভদ্রলোককে লিখিত এবং যাব তারিখ 'লিভার-পুল, জানুয়ারী ১৬ই, ১৮২৯' এবং চিঠিটি স্বাক্ষরিত—'আপনার অকপট বন্ধু, জেম্‌স্‌ ক্রপার'। এর থেকে আমরা এ বিশ্বাসে উপনীত যে ইংলণ্ডের সৎ জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার একটি সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি আছে। চিঠিটির প্রথম অনুচ্ছেদ আমরা উদ্ধৃত কবছি :—

প্রিয়বন্ধু, আমার বন্ধু রবার্ট বেনসন যে বিস্তারিতভাবে এ দেশে আমাদের উভয়ের বন্ধু জন ক্রফোর্ডের কর্মের উদ্দেশ্যেব কথা আপনাকে জানিয়েছেন তা জেনে আপনাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা তত প্রয়োজনীয় মনে করছি না। জে. ক্রফোর্ডেব কার্যাবলী সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই সব খবর জানেন—তাই তাব পুনরাবৃত্তি আমি করব না। ভাবতে ইংরেজদের বসবাস ও অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর রচনা এত-মূল্যবান ও এ সময়ে তার প্রচার এত সমীচীন মনে হয় যে তাঁকে বেশি সংখ্যায় এক অল্প মূল্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস তিনি এখন সে কাজে ব্যাপৃত।

লেখক অতঃপর জনসাধারণের মন উত্তেজিত করবার জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার কথা বলছেন সেই পরিকল্পনার এক অংশ হচ্ছে শিল্পোৎপাদক জেলাগুলিতে বক্তা নিযুক্ত করে পাঠানর ব্যবস্থা করা। তারা ভারত সরকারের পদ্ধতির প্রতি এবং অবাধ-বাণিজ্যের ফলে ভারতে ও চীনে ব্যবসার যে সুযোগ উপস্থিত হবে তার প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কম্পানী ব্যতিরেকে অন্যান্যদ্বার ইয়োরোপ-মহাদেশে চা-আমদানী বিষয়ক ১৮ নং জিও. ২ আইনের ভাষা বিকৃত করে জনসাধারণ ও সাধারণ লেখকের সরল

বিশ্বাসের উপর যে কৌশলী পরীক্ষা করা হয়েছে সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবে এও বলেছেন, "আমার বিশ্বাস যে যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন আমরা শীঘ্র হব তাতে আমরা এই কৌশলী বিকৃতিকরণকে ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারব।"

...৯ই নভেম্বরের 'টাইমস্'-পত্রিকায় ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি বেরিয়েছে, এটিও দেখা যাচ্ছে সেই কারখানা হতে তৈরি যেখান থেকে নানাধরণের বহু ছলনাময় জিনিস সরবরাহ করা হয়। দেশব্যাপী কষ্টকর ব্যবস্থার দরুন এবং আমাদের রাজস্বের ভয়াবহ অবস্থার দরুন ইস্ট ইণ্ডিসের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য করা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দূর করা দরকার —এইসব এই চিঠিতে আছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধির উল্লেখ করে এবং এ কথা বলে যে 'ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি অভূতপূর্ব," —বাজারে ফট্‌কাওয়ালাদের ঢুকতে দেওয়ার পর থেকে—লেখক তাঁর মতবাদ জোরাল করে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে দেশ যদি তাঁর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে তো প্রভূত উপকার পাবে। চীনের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের উপকারিতার সমর্থন করে তিনি বলেছেন,—'গ্রেটব্রিটেন ও চীনের মত আর কোনো দুটি দেশ নেই যারা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা করবার ব্যাপারে এমন আশ্চর্যভাবে পরস্পর-সহায়ক অবস্থায় আছে। তিনি বারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর অন্যায়ভাবে ক্ষমতা অর্পণের কথা বলেছেন যে-ক্ষমতার বলে কম্পানী দেশের জনসাধারণ থেকে চায়ের বর্ধিত মূল্য হিসেবে বার্ষিক ১৫০০০০০ থেকে ২০০০০০০ পাউণ্ড কর বসিয়েছে। এ ধরনের নতুন নতুন ও অসৎ-অভিসন্ধিপূর্ণ আরো অনেক উক্তিই এই চিঠিতে আছে।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এই উদ্ধৃত চিঠি পড়ে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত একজন লেখক, যিনি 'স্বেচ্ছাসেবক' নামে স্বাক্ষর করেছেন, সেই একই পত্রিকায় মিথ্যেগুলি ধরিয়ে দেন।...প্রধানমন্ত্রীকে যিনি চিঠি লিখেছিলেন তিনি পত্রিকার যতটা স্থান নিয়েছেন তার অর্ধেক স্থানে 'স্বেচ্ছাসেবক' সংবাদ-দাতার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং টাইমসের সম্পাদকের সন্তোষ বিধান করে 'জেনে বুঝে সত্যের অপলাপ' দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন।

তিনি পত্রিকায় দেখিয়েছেন, যে আমাদের সনদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রাচ্য বাণিজ্যের আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধি থেকে যে যুক্তি টানা যায় তা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রমপূর্ণ। এই মতবাদের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে যে বাণিজ্য উপকারী হল কি-না। উপকারী হওয়া দূরে থাক এই বাণিজ্য হাজার হাজার লোকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এবং তা যারা অবাধ-বাণিজ্যে আগ্রহীরা অধীরভাবে যা চায় সেই দাবী পূরণের বিরোধী যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষে ইংরেজের বসবাসস্থাপন-সম্পর্কে বাজে কথাগুলি লেখক সংক্ষেপে কিন্তু ভালোভাবেই বাতিল করে দিয়েছেন : তিনি বলছেন, 'ভারতে ইংরেজের বসবাসস্থাপন-সম্পর্কে মি. ক্রফোর্ড তাঁর পুস্তিকায় যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের বিপদ কম কিন্তু হিন্দুদের তাতে অসুবিধা, কারণ তারা ব্রিটেনে স্টীম এঞ্জিন পরিচালনার জন্যে কাঁচা মাল উৎপাদকে পরিণত হবে। হিন্দুস্থানের ধৈর্য্যবান মানুষেরা 'সম্ভবত' (এই কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ) এই অন্যায়ের বলি হবে। আমেরিকার প্রতি ব্যবহারে স্পেনের চরিত্র যেভাবে কলুষিত হয়েছে, আমরা কি আমাদের রপ্তানিবৃদ্ধি সেইরকম অবিচারের মুল্যে ক্রয় করব?'

...এই লেখকের লেখা যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি আনন্দে এখন আমরা অন্য-এক লেখকের দিকে নজর দিই। তিনিও ডিউক অব ওয়েলিংটনের সঙ্গে পত্রবিনিময় কবেন, তবে তিনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। যে 'মর্নিং হেরাল্ড' সংবাদপত্র, এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে কঠোর নিরপেক্ষতা রক্ষা করেছে যে পত্রিকার 'স্তম্ভগুলো একচেটিয়া বাণিজ্য-বিরোধীদের পণ্ডিতিয়ানা ও অযৌক্তিকতা থেকে মুক্ত' সেই 'মর্নিং হেরল্ড' পত্রিকায় ২৪শে নভেম্বর তারিখে একটি চিঠি বেরিয়েছে। এই চিঠিটি মাননীয় ডিউককে সম্বোধন করে লেখা এবং 'ইণ্ডোফিলাস' নামে স্বাক্ষরিত। 'স্বচ্ছাসেবক'-এর চিঠির মত এই চিঠিটিও মনোযোগ দেবার মত। কম্পানীর স্বার্থ আদবেও বিবেচনায় না এনে ইণ্ডোফিলাস জনসাধারণের স্বার্থের ভিত্তিতে প্রশ্নটির বিচার করেছেন। জনসাধারণেরই একজন হিসেবে একদল স্বার্থান্বেষী লোক যে প্রশ্নটিকে উপস্থিত করেছে বিশ্বের সামনে বিশ্বাসঘাতী ছদ্মবেশ সেই ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলতে

চেয়েছেন। আমরা নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত না করে পারলাম না যেখানে লেখক সেইসব সত্য নীতিগুলির বর্ণনা করেছেন, যাদের বিচারের উপর সনদ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি নির্ভরশীল এবং যা আমাদের অভিমতের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।

মাননীয় ডিউক মহাশয়, আপনি ভালোভাবেই জানেন যে এই প্রশ্নটা নিছক ব্যবসায়িক প্রশ্ন নয়। দেশে আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের দৃঢ়তা এবং 'বিদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের ঐহিক আত্মিক শুভ এর উপর নির্ভর করছে।' তত্রাচ এ পর্যন্ত গোঁড়া পুস্তিকা-লেখকেরা ও সংবাদ-না-জানা অজ্ঞ আবেদনকারীর দল তা নিয়ে এমন সব কাঠ-মোল্লাই কথা বলেছেন যেন আসল কথাটা হচ্ছে এই যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ব্যবসায়িক সুযোগ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াবে কি বাড়াবে না, আমাদের কারখানার উৎপাদন-বৃদ্ধিব সহায়ক হবে কি হবে না এবং চার দাম কমিয়ে আনবে কি আনবে না। এই বিষয়ে দেশবাসীদের বেশ প্ল্যান করে প্রতারণা করা হয়েছে। এইজন্যে আমার ঘৃণা ও ক্রোধ এদের উপর এতই অপরিসীম যে নিছক তর্কের খাতিরেও ওদের মত সমর্থন করতে আমার ঘৃণা হয়। 'কিন্তু একথা ধরেই নেওয়া হক যে আমাদের উৎপাদনকারীদের ও বণিকদের সুবিধার জন্যেই কম্পানীব ব্যবসায়িক সুযোগ বন্ধ হওয়া উচিত—কিন্তু তাতেই কি শেষ প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হল?' (কোটেশন—লেখক)।

আপনার মতন মহান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র যে পার্লামেণ্ট যেসব সুযোগ ও নিয়ম থেকে রেহাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে দান করেছে তা একদল বণিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দেওয়া হয় নি। যে বিশেষ অবস্থার দরুন প্রাচ্যে আমাদের অধিকৃত স্থানগুলো বেড়ে গিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে, সেই কারণেই কম্পানী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং আইনের চোখে কম্পানী রাষ্ট্রের অঙ্গ বলে বিবেচিত হচ্ছে। 'যদিও বর্তমানকালের হালফ্যাশানী ও ইতর রীতি অনুযায়ী তাদেরকে বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকারের ঘৃণ্য সমর্থক ও ঠগ বলে বর্ণনা করা হয়।' (কোটেশন—লেখক)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের উপযোগী এমনি একটি আশ্চর্য যন্ত্র যে বলতেই

হবে যে বর্তমানের অসম অবস্থায় আর-কোনো যন্ত্র দিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা কিছুতেই সম্ভব হত না। এই কম্পানীকেও যেসব সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেই সুযোগগুলি সিমেণ্টের কাজ করে তার গঠনটিকে সুসংলগ্ন রাখবে। 'কম্পানীর বাণিজ্যিক চরিত্র যদি নষ্ট করা হয় শাসনক্ষমতা হিসেবে তাদের অস্তিত্বের ভিত্তিই তবে ধ্বংস হয়ে যাবে।' (কোটেশন—লেখক)

অবাধ-বাণিজ্যের কর্ণধাররা তাদের দুরভিসন্ধি ঢাকতে যেসব প্রস্তাব আনে তার মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিটি যত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় এমন আর-কোনটি নয়। 'তারা বলে, রাজ্যশাসকের চরিত্রের সঙ্গে ব্যবসায়িক চরিত্রের কোনো সামঞ্জস্য নেই তাই কম্পানীকে তাদের ব্যবসায়িক চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত করে দাও, এবং তাদের এখন থেকে ভারত শাসন কবতে দাও। আপনি জানেন এর চাইতে অসম্ভব প্রস্তাব আর-কিছু হতে পারে না। ভারতের রাজস্ব সরকারের খবচ বহন করতে সমর্থ। যেখানে রাজস্ব বাঁধাধরা নেই সেখানেও রাজস্ব বাড়াতে গেলে এবং স্থানীয় খরচ হ্রাস করাব চেষ্টা করলে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি তাই এই তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করব— লাভ কোথেকে আসবে যে লাভ থেকে ভারতে যাঁদের সম্পত্তি আছে তাঁদের মূলধনের ব্যবহারের জন্যে এবং মূলধন বিপন্ন করার জন্যে ক্ষতিপূরণ করা হবে?' (কোটেশন—লেখক)

এ প্রবন্ধ যখন লেখা হয় দ্বিতীয় চিঠিটি তখনো প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু আগে থেকেই আমরা বলতে পারি যে স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়াও লেখক ছাপা হয়েছে এমন অনেক জিনিস পাবেন যা তিনি 'তাঁরই ভাষায় দেশের নিকট এবং আপনার নিকট বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে পরিবেষণ করতে পারেন'।

আমরা সজাগ ও হুঁসিয়ার থাকবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং দেশকে লেখক-কথিত 'একদল বিপ্লবী দ্বারা' অন্ধভাবে পরিচালিত হতে আপ্রাণ বাধা দেব। সে-সব বিপ্লবী দেশের মঙ্গল চায়না, আত্মস্বার্থ সিদ্ধ করতে চায়।' (কোটেশন—লেখক)।

সে দিন ইংলণ্ডে একচেটিয়া-বাণিজ্যের উপস্বত্বভোগী বণিকদের সঙ্গে

অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-দাবী-করনেওয়ালা বণিকদের যে লড়াই চলছিল তার ঝাঁঝটার খাস হল্‌কাটুকু উপভোগ করাবার জন্যে 'এশিয়াটিক জর্নল'-এর প্রবন্ধটির প্রায় সবটাই উপরে উদ্ধৃত করেছি। 'এশিয়াটিক জর্নল' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সমর্থক, তাই বিপক্ষদের উপর তার যেমন রাগ তেমনি ঘৃণা। ডিউক অব ওয়েলিংটন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লণ্ডন 'টাইম্‌স্‌'-এ একটি চিঠি বের হয়। পত্রলেখক অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের কি ক্ষতি হচ্ছে তার আলোচনা করেন তাঁর চিঠিতে। তিনি বলেন যে চীনদেশ থেকে ইংলণ্ডে চা আমদানী করার ব্যবসাটির একচেটিয়া-অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে থাকায় পনেরো লক্ষ থেকে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড বেশী দিয়ে চা কিনতে হচ্ছে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের। আর যায় কোথা! ভীমরুলের চাকে ঢিল ফেলে যত না বিপদ, মুনাফার চাকে ঢিল ফেললে তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদ। 'ভলান্‌টিয়ার' এই নামে সই করে একজন চিঠি লিখলেন 'টাইম্‌স্‌'-এ। 'এশিয়াটিক জর্নল্‌' ভারি খুশি। এই 'ভলান্‌টিয়ার' মহোদয় নাকি অতি অল্প কথা ব্যবহার করেই আগের পত্র-লেখকের সব যুক্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। এই 'ভলান্‌টিয়ার' ভদ্রলোকটির মতে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাড়ার ফলে ভারতবর্ষের হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়েছে, তারা ধনেপ্রাণে মারা গেছে। 'ভলান্‌টিয়ার' মিথ্যে কিছু বলেন নি, শুধু দেখা যাচ্ছে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার রদ করে সব ব্যবসায়ীদের ভারতের বাজারে মাল পাঠাবার অধিকারের দাবী উঠতেই তাঁর হঠাৎ হাজার হাজার ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে পড়ে গেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে ভারতবাসীদের যে কী সর্বনাশ ঘটবে তা কল্পনা করে 'ভলান্‌টিয়ার' আকুল হয়ে পড়েছেন। স্পেন যেমন করে আমেরিকার সর্বনাশ করেছে ইংলণ্ড যেন সেইরকম করে মাল রপ্তানি করে ভারতবর্ষের সর্বনাশ না করে; অর্থাৎ কি-না যাকিছু মাল পাঠাবার তা যেন শুধু কম্পানী পাঠায় অন্য কেউ না পাঠায় এই আবেদন জানিয়েছেন ভদ্রলোক।

তার পরে আর-এক ভদ্রলোকের নজির দিয়েছেন 'এশিয়াটিক জর্নল'। এই ভদ্রলোক 'ইণ্ডোফিল্‌' নামে সই করে এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন 'মর্নিং

হেরল্ড্' সংবাদপত্রে। এই 'মর্নিং হেরল্ড্' পত্রিকার অপক্ষপাতিত্বের তারিফ করে 'এশিয়াটিক জর্নল' বলছেন যে এই পত্রিকা 'একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার-বিরোধীদের ভ্রান্ত যুক্তি ও কচ্‌কচানি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে।' অর্থাৎ কি-না এই পত্রিকা একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকারের বিপক্ষে যারা তাদের কোন কথা না ছেপে পত্রিকার অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আর এই 'ইণ্ডোফিল্' যে মহৎ ব্রত নিয়ে দেখা দিয়েছেন তা তাঁর ভাষাতেই হচ্ছে 'একদল স্বার্থান্বেষী লোক একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার বনাম অবাধ-বাণিজ্য-অধিকার—এই বিরাট সমস্যাটিকে যেরকম করে সাজিয়েগুজিয়ে জনসাধারণের সামনে ধরে দিয়েছে, সেই জঘন্য ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে।' এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'ইণ্ডোফিল্' যে খোলা চিঠি ছাপালেন 'মর্নিং হেরল্ড্' পত্রিকায় ডিউক অব ওয়েলিংটনের উদ্দেশ্যে, তার প্রারম্ভেই তিনি লিখলেন—'আপনি ভালো করেই জানেন যে এই ব্যাপার শুধু ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার নয়, এটি আমাদের নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্রের integrityর প্রশ্ন আর অন্য দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক মঙ্গলের প্রশ্ন তোলে।' ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্যের অধিকারে হাত পড়লে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকেব পাবমার্থিক ও লৌকিক মঙ্গল যে কিভাবে চোট খাবে তা ভেবে 'ইণ্ডোফিল্' শিউরে উঠেছেন। যারা চায়ের দাম নিয়ে হৈ-চৈ করছিল, ইংলণ্ডের রপ্তানি বাড়াবার কথা বলছিল কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার রদ করে দিয়ে, তাদের সম্বন্ধে 'ইণ্ডোফিল্'-এর ঘেন্নার আর শেষ নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কী 'একটি আশ্চর্য এন্‌জিন, কি অদ্ভুত একটি যন্ত্র', একটি বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করবার জন্য, সে কথা বলেই 'ইণ্ডোফিল্' বললেন—'কম্পানীর বাণিজ্যের দিকটা সরিয়ে নাও, অমনি তার শাসনক্ষমতার অস্তিত্বের প্রধান অবলম্বন ধ্বসে যাবে।' তাই যারা বলছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী গভর্মেণ্ট হিসেবে ভারত-শাসন করুক, কিন্তু ভারতে তাদের ব্যবসা বন্ধ করুক কেন-না রাজ্যশাসনের সঙ্গে ব্যবসা মেশানো সঙ্গত নয়, তাদের নির্বুদ্ধিতা (!) বিদ্রূপ করে 'ইণ্ডোফিল্' বল্‌ছেন—'ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকরা তাঁদের মূলধন ব্যবহার করতে দিয়েছেন ও অনেক ঝক্কি নিয়েছেন; সেই মূলধন ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যে ও ঝক্কি পোহানোর জন্যে তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে কোথা থেকে যদি না মুনাফা করা যায়?'

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখের 'লণ্ডন কুরিয়ের'-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে এইটে বের হল—

ভোরের কাগজে যাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয়েছে এমন একজন পুস্তিকাকার, কম্পানীকে এই বলে দোষী করছেন যে এর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কোনো আমলই দেয় না এবং ভারতীয় কৃষির অধঃপতন ঘটায়। এটা সহজেই অনুমেয় যে এমন সব ব্যক্তি আছে যাদের কাছে কম্পানীর বাণিজ্যের একটি অংশ খুবই গ্রহণীয় হবে, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে সনদের ফলে ভারতীয় উৎপাদন ক্ষমতার সত্যিই এমন দুর্দ্দশা হয়েছে কি না যে কথা একচেটিয়া বাণিজ্য-বিরোধীরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন। এই সনদ ১৮১৩ সনে দেওয়া হয়। তাই পনেরো বৎসর যাবৎ তা চালু আছে। যদি এই সনদ সত্যই উৎপাদনশক্তির বিরোধী হয়ে থাকে তার ধ্বংসলীলা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে দেখা যেত এবং অনুভূত হত। এখন অঙ্কের দিকে নজর দেওয়া যাক।

১৮১৪ সনে চায়ের আমদানী ২৬ মিলিয়ন পাউণ্ডের কিছু বেশি হয়েছিল। এই অভিশপ্ত সনদের অধীনে ছয় বৎসরের মধ্যে তা বেড়ে ২৮ মিলিয়ন হয়েছে। এবং আরো ছয় বৎসরে তা বেড়ে গড়ে ২৯½ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এখানে শতকরা ১৩½ ভাগ পরিমাণ উন্নতি দেখা যায়। পুস্তিকাকার আমাদের বলছেন এই সনদের অধীনে সুতোর পশম উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ১৮১৪ সনে ২৮৫০৩১৮ পাউণ্ড সুতোর পশম আমদানি হয়েছিল ১৮২৬ সনে তা মাত্র ২১১৮৭৯০০ পাউণ্ড হয়েছে কিন্তু পরবর্তী বৎসরগুলোতে তা বেড়ে ৬৭৪৫৬৪১১ পাউণ্ড হয়েছে। যে ব্যক্তি একে নিম্নগামিতার লক্ষণ বলছেন তাঁকে সকালে প্রকাশিত একটি খবরের কাগজে 'ভারতীয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হতে পারেন তিনি ওয়াকিবহাল কিন্তু সংখ্যায় তিনি বিশেষজ্ঞ নন (লণ্ডন কুরিয়ের—২৬শে মে, ১৮২৮)।

লড়াইটা যত জমে উঠেছে নীতি ও পরমার্থের আলখাল্লার তলা থেকে মুনাফার ঝোলাঝুলিগুলো তত ঠেলে বের হয়ে এসেছে। একালের মত সেকালেও বনেদী স্বার্থের উপর যারাই আঘাত হানতে গেছে তাদের 'বিপ্লবী'

বলে ছাপ-দেবার চেষ্টা চলেছে। অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করছিল যারা সেই বণিকদের 'এক গোচ্ছা বিপ্লবী' বলে অভিহিত করে লোক ভড়কাবার চেষ্টা করতে ত্রুটি করেন নি 'ইণ্ডোফিল্' ও 'এশিয়াটিক জর্নল্'-এর সম্পাদক।

মতবাদের লড়াই সে সময়ে কি রকম জমে উঠেছিল ইংলণ্ডে তার চেহারাটা আমরা এতক্ষণ দেখলুম। অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থকেরা ছিল দলে ভারী। ভারতের বাজারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার থাকায় যে-সব কলকারখানার মালিকেরা ভারতে মাল পাঠাতে পারছিল না, তারা সব অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থক হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। শুধু বই লিখে ও সংবাদপত্রে চিঠি-চাপাটি পাঠিয়ে তারা ক্ষান্ত ছিল না। ইংলণ্ডের নানা সহর থেকে আর্জি আসছিল পার্লামেণ্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করে। প্লিমথ্-এর ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, জাহাজ কম্পানীর মালিক ও অন্যান্য বণিকেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে এই আবেদনটি পার্লামেণ্টের কাছে পাঠাল—

> ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে যে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তা জনসাধারণের মঙ্গলের বিরোধী। তার কারণ বিদেশী রাষ্ট্রে যেখানে নিয়ন্ত্রণ-রহিত বাণিজ্য অবারিত সেখানকার দ্রব্যের চাইতে এখানে ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য অধিক। চীনে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে যেকালে অন্য দেশের ব্যবসায়ীরা অবাধ-বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করছে তখন অবাধ-বাণিজ্য বাধা দিয়ে ব্রিটিশ প্রচেষ্টার অনিষ্টসাধন করা হচ্ছে। অতএব তারা প্রার্থনা করছে, ভারতীয় ও চৈনিক বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা জানবার জন্যে একটি সমিতি গঠিত হক, যাতে ব্রিটিশ প্রজারা এই দুটি দেশের বাণিজ্যকার্যে যোগদান করতে পারে। ইতিমধ্যে যতদিন না সেটা হয় ততদিন এই দুই দেশের বাণিজ্যের অংশ যেন তারা পেতে পারে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে তারিখে গ্লস্টারের (Gloucester) পশমী বস্ত্রের কারখানার মালিকেরা পার্লামেণ্টে আর্জি পাঠাল চীন দেশ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা করার পথে যে সব আইনগত বাধা আছে সেগুলি দূর করতে।

তারা লিখ্‌ল সেই আর্জিতে যে আইনগত বাধাগুলি দূর হলে—

ব্রিটিশ শিল্প ও প্রচেষ্টার জন্যে একটি অফুরন্ত ক্ষেত্র খুলে যেতে পারে, যা থেকে বর্তমানের সভ্যতার আলোকে আলোকিত যুগের পক্ষে অযোগ্য বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকারের দ্বারা তারা বঞ্চিত। বাণিজ্যের এই একচেটিয়া-অধিকার এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের চাহিদা ও যোগানের পক্ষে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পক্ষে অপ্রতুল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সান্ডারল্যাণ্ডের (Sunderland) জাহাজ-ব্যবসায়ীরা ও বণিকেরা ভারতের ও চীনের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটি বসানোর দাবী করে ও অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগের দাবী করে পার্লামেণ্টকে জানাল যে—

চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশেব উৎপাদিত দ্রব্য পৃথিবীর নানা স্থানে জাহাজ-যোগে বহন করে বিদেশী বণিকরা অপর্যাপ্ত ব্যবসার সুযোগ লাভ কবেছে। তা থেকে আবেদনকারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে যদিও বিদেশী জাহাজগুলো ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য দ্বারা ব্রিটিশ বন্দরেই প্রাচ্য বাজাবের জন্য বোঝাই হয়ে থাকে। শুধু ভারতবাসীদের হাতে তুলোর চাষ ফেলে রাখাতে ভারতীয় তুলোর মান নীচুতে নেমে গেছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতের জমিতে তুলো-উৎপাদনের জন্যে মূলধন লাগাতে নিষেধ কবা হয়েছে। অপরদিকে নীলের উন্নতি হয়েছে আশাতিরিক্ত এবং তার চাষ ব্রিটিশ তদারকে এসে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭ই মে তারিখে বার্মিংহ্যাম-এর চেম্বার অব কমার্স পার্লামেণ্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের দাবী করে লিখ্‌ল—

১৮১৩ সন থেকে যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি তার থেকে এটা প্রমাণ হয় যে ইয়োরোপে তৈরি কোনো দ্রব্য ক্রয় করবার শক্তির বা ব্যবহার করবার মেজাজের অভাব ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের আদবেই নেই। আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহ যে চীনের সঙ্গে সরাসরি লেনদেন সেই একই শক্তির ও মেজাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে ভারতবর্ষে। তারা পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে বাণিজ্য সম্বন্ধে যেসব নিষেধবিধি আছে সেগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রার্থনা করে, যাতে করে ব্রিটিশ ভারত, চীন

দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব দ্বীপগুলোর সঙ্গে আমাদের লেনদেনের বাধা অপসারিত হয়।

লীড্‌স্‌-এর ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে পার্লামেণ্টকে আবেদন জানাল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর চার্টার পুনর্বার বহাল করবার সময়ে যে তদন্ত করা দরকার সে তদন্ত হওয়া উচিত—

ভারত এবং চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের বিষয়ই তদন্ত হবে তা নয়, ভারত উপদ্বীপে ইংরেজের বসবাস-ব্যবস্থার জন্য উন্মুক্ত রাখার কথাও বিবেচ্য।

ঐ একই তারিখে ওয়েক্‌ফিল্‌ড্‌-এর কারখানার মালিকেরা ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত করে জানালো যে—

ভারতে ও চীনে অবাধ-বাণিজ্যের পথ খুলে দিলে দেশের কৃষি, ব্যবসায়িক, ও শৈল্পিক স্বার্থ প্রভূত পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করবে। পশম-ব্যবসায় বৃদ্ধি পাবে এবং লীড্‌স্‌ ও তার আশেপাশের জায়গা পূর্ববৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এখন যে পশম বস্ত্রের চাহিদা নেই তার চাহিদা বৃদ্ধিতে কৃষকরা উপকৃত হবে। তারা এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে বাণিজ্য কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হোক এবং ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে ভারত ও চীনের লেনদেনের পথ খোলা হক্।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে ম্যান্‌চেস্টার সহরের ব্যবসায়ীরা ও কারখানার মালিকেরা পার্লামেণ্টকে জানালো—

চা-এর বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার জনসাধারণের পক্ষে প্রচুর অনিষ্টের কারণ হয়েছে এবং যা ক্ষতি হচ্ছে সেই অনুপাতে তা রাজস্বে সমান সুবিধেজনক হচ্ছে না। তাদের অধীনস্থ জায়গাগুলি থেকে আইন আদালত ব্যাতিরেকে কাউকে সোজাসুজি ও অন্যায় ভাবে নির্বাসন দেবার যে ক্ষমতা কম্পানীর আছে সেই ক্ষমতা ইংরেজদের মৌলিক অধিকারের বিরোধী, গ্রেটবৃটেন ও ভারতের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের অছিলা সমর্থন-যোগ্য নয় এবং তার অস্তিত্ব আর থাকা উচিত নয়। ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-জাত প্রজাদের উৎসাহ দিলে তার সুফল ধ্রুব। তাতে মূলধনের সঞ্চয় ও

বিনিয়োগ বৰ্দ্ধিত হবে; ইয়োরোপের শিল্পকলা, সভ্যতা ও সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করবে এবং যেখানে খ্রীষ্টধর্মের নামও শোনা যায়নি সে সব অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে তার আশীর্বাদ গিয়ে পেঁছুবে।

ব্রিস্টল্ সহরের ব্যাংকার, ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরোধ করে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে পার্লামেণ্টকে জানালো—

বর্তমান কালের বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলি অপসারিত করলে ব্রিটিশ দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, আমাদের শিল্প ও কৃষিকে উৎসাহ দেওয়া হবে, জাহাজ-পরিবাহন উৎসাহিত হবে এবং জাতীয় আয় বাড়বে। ইংরেজদের ভারতে বসতির অধিকাব থাকা উচিত, ব্রিটিশ জনসাধারণের শিল্প প্রচেষ্টার দ্বার সেখানে উন্মুক্ত থাকা দরকাব। তাদের শক্তি ও উদাহরণ জনসাধারণকে শিল্পে, নৈতিক চবিত্রে, ধর্মে, নিরাপত্তায়, শৃঙ্খলায়, আনুগত্যে উন্নত করবে এবং আমাদেব সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থায়ী করতে সাহায্য করবে। এই জনকল্যাণবিধাযক বিধানগুলি বেশীবভাগ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ভীরু ও অব্যবস্থিত নীতির পরিপন্থী হয়েছে। দীর্ঘদিনের বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কম্পানী নিজের বা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের বা এদেশের সুবিধায় ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক ও রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনার অযোগ্য।

ঐ একই তারিখের দরখাস্তে লিভারপুল্-এর নাগরিকেরা ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেণ্টকে জানালো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করার সনদ রদ করে দিতে ও সকলকে ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগের সুযোগ দিতে—

যে বিশেষ সুযোগগুলি কম্পানী এতোকাল ভোগ করেছে সেগুলি সম্পূর্ণ রদ করার দরকার কেন না সেগুলি সব সময়েই অন্যায় এবং দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, আমাদের জাতীয় অধিকারের বিরুদ্ধ এবং যে উদার-নৈতিক পন্থা সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক আইন সূচিত করছে তার পরিপন্থী।"

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে গ্লাস্‌গো সহরের ব্যবসাদার, কারখানার মালিক ও ব্যাংকারেরা পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে দাবী করলো যে—

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদ-কাল ফুরিয়ে যাবার পর উত্তমাশা

অন্তরীপের পূর্বে স্থিত দেশ সমূহের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের পথ মুক্ত করা হোক। ১৭৯৩ ও ১৮১৩ সনে পার্লামেণ্ট কম্পানীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী-প্রদত্ত বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্বেও কম্পানীর অধিকার ও একচেটিয়া বাণিজ্য সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার এর চায়ের একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার দেশের ব্যবসায়ের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর ও দূষণীয়। এই একমাত্র স্থযোগের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী বহু বৎসর যাবৎ ইয়োরোপেব অন্যান্য বন্দরে অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে দামে চা পাওয়া যায় তার দ্বিগুণ দামে চা বিক্রি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রজারা সরকারকে যে কর দিতে হয় তা ছাড়া চীনের সঙ্গে অবাধ লেনদেনের স্থযোগ পাচ্ছে, এই সৌখিন দ্রব্যের সার্বজনীন ব্যবহারের দরুণ যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বার্থে গুরুভার কর দিতে হয় তাতে জাতীয় শিল্প খর্বীকৃত হয় কাবণ তা প্রাচ্যদেশগুলিতে বাণিজ্যে ব্যাপৃত বণিকবিশেষের বা বেসরকারী কম্পানীগুলির ব্যাপক অনিষ্ট সাধন করে। এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রজার বন্ধুদেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করবার যে মৌলিক অধিকার আছে সেই অধিকারের বিরোধী।

২১শে মে তারিখে ল্যাংক্যাস্টার-এর ব্যবসায়ীরা ও কলেব মালিকরা পার্লামেণ্টকে দরখাস্ত পাঠিয়ে জানালো—

চীনে ও ভারতের অভ্যন্তরে অচিরেই বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে, একচেটিয়া চায়ের ব্যবসা রদ করা হোক, রাজার প্রজাদের ভারতে বসতি স্থাপনের অধিকার আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক, কোনো অপরাধের বিচার ব্যতিরেকে নির্বাসনের ক্ষমতা বাতিল করা হোক এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্থানেই বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধান সুরু করা হোক।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখ ডাবলিন সহরের চেম্বার অব কমার্স পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত করে জানালো—

ইস্ট ইণ্ডিসে ও চীনে ব্যবসা করার বিরুদ্ধে যে সব নিষেধ আছে সেগুলি দূর করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও প্রভূত উপকার করা হবে, তার উৎপাদন ব্যবস্থার ও ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের

দেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয় এমন রাষ্ট্রগুলির ভ্রান্ত বিধিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। চীনে একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দিক থেকেও অন্যায় এবং ফলের দিকে থেকেও অনৈতিক। চায়ের প্রকৃত মূল্যের চাইতে তার দাম অনেকগুণ বাড়িয়ে জাতীয় করের উপর ভার বাড়ানো হচ্ছে। এই প্রার্থনা যে উল্লিখিত বাণিজ্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ-বিধি অপসারিত করা হোক।

হ্যালামশায়ার-এর ছুরি-কাঁটা ইত্যাদি নির্মাতাদের কর্পোরেশন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে দরখাস্ত পাঠিয়ে পার্লামেণ্টের কাছে অভিযোগ করলো—

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও তার অভ্যন্তরে লেনদেনের বাধার বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অন্যায় আইন এবং যে সব বিশেষ সুযোগ ভোগ করে সেই সব বিশেষ সুযোগ দ্বারা চীনের সঙ্গে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্য করতে দিচ্ছে না। চায়ের এবং চীনদেশে প্রস্তুত অন্য সব জিনিসের দাম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে ইংলণ্ডে অনেক বেশি। তার কারণ হচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার। শেফিল্ডের লোহার ব্যবসায় পড়তির দিকে। ভারতের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যে তার উন্নতি হতে পারত। চীন ও ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রজার অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের জন্যে ও ভারতে বসতি স্থাপনের অনুমতির জন্যে আবেদনকারীরা 'অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হোক এই প্রার্থনা জানাচ্ছে।

এইগুলি ছাড়া আরো অগুন্তি দরখাস্ত ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি কলকারখানাওয়ালা সহর সেদিন পার্লামেণ্টের কাছে পাঠিয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদ রদ করে দেবার দাবী ও তাদের সকলকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেবার দাবী জানিয়ে।

বাংলার জমিদারেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পার্লামেণ্টের কাছে তাঁদের আর্জি পাঠালেন। সেই আর্জি এখানকার কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মাসের "বেঙ্গল হরকরা"-তে এই আর্জির সম্বন্ধে একটি চিঠি বের হল। পত্রলেখক হচ্ছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথ

নাছোড়বান্দা। স্বয়ং জমিদার হয়েও জমিদারদের তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেন না। ইতিহাস এই রসিকতাটুকু করে চলে—শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থের মুঠো ফুটো করে দেয় সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হোলো "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায়।

বেঙ্গল হরকরা এবং ক্রনিকেলের সম্পাদক সমীপে

মহাশয়,

'বল'-এর সম্পাদক অবাক হয়ে বলছেন, একজন দেশীয় জমিদার নাকি বিদেশী ও অপরিচিতদের তাঁর দেশে প্রবেশ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি সম্পাদককে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে দৃষ্টি দিতে বলি এবং তাঁর সান্ত্বনার জন্যে দৃঢ়ভাবে বলি যে কোনো দেশীয় জমিদারই কোনো বিদেশী বা অপরিচিতকে তাঁর দেশে এসে বসতি স্থাপন করতে আমন্ত্রণ জানান নি। বিদেশী অপরিচিতরা নিজেরাই প্রথম এদেশে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁদের দেশবাসীদের তাঁদের অনুসরণ করতে ও ব্যবসায় ও অন্যান্য সাধু কাজে ব্রতী হতে আমন্ত্রণ করেন এবং ক্রমে এই বিরাট সাম্রাজ্যের শাসক হয়ে ওঠেন।

এখন প্রশ্ন এই যে এই বিদেশী অপরিচিতেরা দেশীয় অধিবাসীর নিকট জঘন্য বলে প্রতীয়মান হয়েছেন কি না, এবং তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছেন কি না যার ফলে দেশীয় অধিবাসীরা বিদেশীদের শত্রু মনে করে এবং তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী ও সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না অথবা দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতি এই বিদেশীরা বন্ধুভাবাপন্ন এবং উপকারী বলে দেখা গেছে এবং তাঁরা দেশীয়দের অবস্থা-উন্নতির সহায়ক হয়েছেন। অভিজ্ঞতার মারফত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হলে কলকাতা-অধিবাসী দেশীয়দের এবং ওই বিদেশীদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বর্তমান তা অনুসন্ধান করতে হবে। কলকাতাতেই সমস্ত পদের ও বর্ণনার অসংখ্য বিদেশী—যাদের জন বুল দানব আখ্যা দিয়েছেন—বসবাস করবার বাণিজ্য করবার এবং দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে লেনদেন করবার অনুমতি পেয়েছেন। এবং যেখানে উভয় পক্ষই সমানভাবে ব্রিটিশ আইনের রক্ষণাবেক্ষণ পেয়ে থাকেন।

কলকাতায় বিদেশী ও অপরিচিতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যায়তন আছে, সেখানে দেশীয় যুবকদের ইংরেজি ও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদেশীদের অনেক ব্যক্তি দেশীয়দের মধ্যে বিদ্যাবিতরণের জন্যে কেবল যে অর্থদান করেন তা নয়, শিক্ষার উন্নতির জন্যে তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমও করে থাকেন। এখানে অনেক ধনী ও জ্ঞানী দেশীয় লোক আছেন, যাঁরা অনেক বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং বিদেশী ও অপরিচিতদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দরুণ অনেকাংশে সংস্কার মুক্ত। তাঁরা বিদেশীদের অনুসরণে বাগান বা বাড়ি তৈরী করতে এবং তা সাজাতে লজ্জা বোধ করেন না। বিদেশী প্রতিবেশীরা রায়তকে বা যারা তাদের অধীনস্থ তাদের দলন করার কাজকে নিন্দনীয় মনে করেন। কলকাতায় হাজার হাজার মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক আছে যারা বিদেশী ও অপরিচিতদের পোষকতা লাভ করে খানিকটা স্বাধীনতা পেয়েছে এবং শিক্ষার ও চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করেছে। রোজই আমরা দেখতে পাই রায়ত নামে আখ্যাত নিম্নশ্রেণীর হাজার হাজার লোক বিদেশী ও অপরিচিতদের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য পেয়ে বাসস্থান ও পরিধেয় পাচ্ছে। তার জন্যে উপরিওয়ালাদের কাছে এরা যে বিসদৃশ ঠেকছে তা না এবং তারা বংশানুক্রমিক জমিদারদের বিরুদ্ধাচরণও করছে না।

মফস্বলে যেখানে বিদেশীদের বসবাস নিষিদ্ধ সেই সব জায়গায় চেহারায়, পোষাকে এবং সুবিধা ভোগে তারা যে সব ক্ষুদে জমিদারদের ছেলে এবং আত্মীয়দের ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে মফস্বলে এই সব জায়গায় অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ব্যতীত আর কিছু নেই।

সাধারণ বুদ্ধি ও সততা-সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুক এবং উভয়ের বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার তুলনা সততার সঙ্গে করে প্রকাশ্যত বলুক যে সে আমাকে সমর্থন করে কি না যখন আমি বলি, "যে ব্যক্তি এ দেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসতির বিরোধিতা করে—অবশ্য তারই সঙ্গে বিচার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করতে হবে—সে লোক দেশীয়দের এবং তাদের ভবিষ্যৎ

বংশধরদের শত্রু কি না।" এখন 'বুল'-এর সম্পাদক মহাশয়ের কাজ হবে এর-বিপরীতটি সত্য বলে দেখানো ও প্রমাণ করা, প্রমাণ করা যে বিদেশীরা দেশীয় অধিবাসীদের নিকট জঘন্য অপ্রীতিকর এবং তাদের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়েছে। এ চেষ্টায় যদি তিনি সফল হন, আমার বক্তব্য আমি প্রত্যাহার করব।

মার্চ্চ ৮, ১৮২৯ আপনার বিনীত পরিচারক

জনৈক জমিদার

এই চিঠি প্রমাণ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ঐতিহাসিকদৃষ্টিসম্পন্ন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। প্রথমেই তিনি 'জন্‌বুল্‌'-এর ভারতবর্ষীয়-প্রীতির ভাণ ও দ্বারকানাথকে ইংরেজ-ভক্ত প্রমাণ করবার অপচেষ্টা—এই দুটি ভণ্ডামিকে ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। তিনি কিম্বা অন্য কোনো জমিদার যে ইংরেজদের এদেশে আনেননি, তারা যে নিজেরাই লাভের আশায়, ব্যবসার খাতিরে এদেশে এসে জুড়ে বসেছে সে কথা দ্বারকানাথ "জন্‌বুল্‌"-কে যুত্‌সই করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার পরে শিক্ষার বিস্তারে এই বিদেশী আগন্তুকেরা যে কতো কাজ করছেন, তার ফলে দেশের যে কতো উপকার সাধন করা হচ্ছে সেটিও দ্বারকানাথ সবল শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও যে ভারতীয়েরা এই বিদেশীদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন সেটিও তিনি জানিয়ে দিলেন।

তার পরে দ্বারকানাথ আরো গোড়া-ঘেঁসা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাজার হাজার লোকেরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে চিন্তার ও শিক্ষার স্বাধীনতার রসাস্বাদন করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, যে সব চাষীরা এই বিদেশীদের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছে, তারা অন্য চাষীদের চেয়ে খাওয়া-পরা থাকায় অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তাই দ্বারকানাথ দৃপ্ত ও দ্বিধাশূন্য ভাবে বলেছেন—"যে কোনো সহজবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যার সততা আছে সে কলিকাতার ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে তাদের শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক ও ঘরোয়া অবস্থার তুলনা করে দেখুক। তার পরে সে সর্বসাধারণের সামনে খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করুক যে আমার এই মন্তব্য যে, যারা এদেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাসের বিরুদ্ধে, অবিশ্যি সে বসবাস বিচার সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিবর্তন

সাপেক্ষ, তারা এদেশের বর্তমান বাসিন্দাদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু—সেই মন্তব্য যথার্থ কিনা।” বিচারসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভারতীয়দের ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যে পক্ষপাতদুষ্ট পার্থক্য করা হোতো, সেই পার্থক্য দূর করে তবে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বাস করতে দেওয়া যেতে পারে—এই ছিলো দ্বারকানাথের মত। ভারতীয়েরা ও ইয়োরোপীয়েরা এক আইনের আওতায় আসুক এই ছিলো দ্বারকানাথের সুস্পষ্ট অভিমত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হতে হয় তাঁর দূরদৃষ্টি দেখে। দেশের লোক শিক্ষাহীন, অসাড় জড়ত্বের মধ্যে তারা পড়ে ছিলো। যদি তাদের জীবনে নতুনত্বের স্পন্দন আন্‌তে হয়, তাদের এই জড়তা দূর করতে হয়, তাহোলে ভারতবর্ষের তৎকালীন বিশেষ অবস্থায় ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শ ছাড়া যে সে জড়তা দূর করবার অন্য কোনো উপায় ছিলো না সেটি দ্বারকানাথ নিঃসংশয় ভাবে বুঝেছিলেন। তাই অবুঝদের নিন্দে আর স্বার্থান্বেষীদের মিথ্যে অপপ্রচার, সব তুচ্ছ করে, তিনি অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তন ও ইংরেজদের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের সুযোগ দান সমর্থন করেছিলেন। তার ফলে যে অনেক লোকের জীবিকা-উপার্জন পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনেক গ্রাম্য কুটীর-শিল্প ধ্বংস হবে তা' দ্বারকানাথ জানতেন। কিন্তু কবে কোন পরিবর্তন ঘটেছে ব্যথাহীন ভাবে? কিছু লোকদের অসুবিধে করেই ইতিহাস তার পরিবর্তনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণের সময়ে যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর প্রবর্তন কুটীর-শিল্পের ভগ্নস্তূপের উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে সব দেশে। ইতিহাস আর যাই করুক বোষ্টমী করে না। দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে সেটা বুঝেছিলেন।

এই ভাবে যখন বাকবিতণ্ডা বেশ জমে উঠেছে তখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে লর্ড বেন্‌টিংক নিম্ন-উদ্ধৃত রিপোর্টটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্‌টরদের কাছে পাঠালেন :—

> ভারত যদি শিল্প ও জ্ঞানে ইংলণ্ডের কাছে ঋণী হয় তবে যে তা ভারতের পক্ষে অশেষ সুবিধার কারণ হবে তা প্রমাণ করতে আমার মনে হয় কোনো কষ্ট-কল্পিত যুক্তি দিতে হবে না। আইনসভা প্রকাশ্যত সত্য ঘোষণা করেছে : সরকারের প্রতিদিনকার কার্যে এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টায় তা মেনে নেওয়া

হচ্ছে। আমার মনে হয় এও সন্দেহ করা চলেনা যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তার এবং জীবন শিল্পে তার প্রয়োগ ধীর গতিতে হবে যদি না এই নীতির সঙ্গে জীবিকা-ব্যপদেশে ইয়োরোপীয়দের এদেশবাসীদের সঙ্গে মিশবার উদাহরণ জুড়ে দিতে পারি এবং যে নীতি তারা গ্রহণ করুক আমরা আশা করি তার প্রকৃতি ও প্রকৃত মূল্য এবং যে পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করুক আমরা চাই তার ফল হাতে-কলমে না দেখান হয়। এটা সহজেই বোধগম্য যে এ উপায়ে দেশীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করা ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের বেশ কিছু লোক এবং তাদের বংশধররা এদেশে বসবাস করাতে নানাপ্রকার জাতীয় সুবিধা দেখা দেবে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা মানে হচ্ছে এই যে যে-প্রাধান্যের জোরে আমরা ভারত-রাজ্য পেয়েছি তা অস্বীকার করা এবং জাতীয় সম্পদ ও শক্তির এবং সুশাসনের উপর জাতীয় চরিত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা। এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার মানে হচ্ছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাষাগত, আবেগগত ও স্বার্থের ঐক্যের কোনো মানে নেই তাই বলা; পৃথিবীর যেখানে যেখানে বৃটিশ-পতাকা উত্তোলিত সেই সব জায়গায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়েছে তাকে অবজ্ঞা করা। এই প্রশ্ন করার ও সন্দেহ প্রকাশ করার মানে হবে, আমাদের বণিক ও শিল্পীদের বলা যে বাজার সৃষ্টি করবার ব্যাপারে মানুষের জাতিগত অভ্যাসের কোনো মূল্য নেই এবং প্রচেষ্টা, কৌশল, মূলধন এবং ঋণ মূলধন তৈরী করে তাও দ্রব্য-উৎপাদনের বেলায় অর্থহীন।

যা হোক, এটা সম্ভবপর যে অনেকেই বাস্তব অবস্থাটা বেশ সন্তোষজনক মনে করতে পারেন যাতে কোনো বৃহৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন, যে পরিবর্তনের ফল সঠিকভাবে ধারণা করা যায় না, যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, এবং সম্ভবত ইয়োরোপীয়দের দেশের অভ্যন্তরে বসবাস করবার ফল এবং জমি কিনবার অনুমতি এমন কুফল দিতে পারে বলে বিবেচিত হতে পারে যে এই অনুমতি দানের সুবিধাগুলো তাতে নাকচ হয়ে যায়। দেশের প্রকৃত অবস্থাটা কী? এ কথা কি সত্য নয় যে বেশির ভাগ লোকই অতিশয় দরিদ্র এবং অজ্ঞ? প্রতিদিনই কি আমরা

বুঝতে পারছিনে যে আমাদের কর্ম্মচারীরা সুশাসনের জন্যে যে জ্ঞান প্রয়োজন, সেই জ্ঞান কতো কম রাখে এবং তাদের মধ্যে আবেগের ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের কত অভাব, যে ঐক্য ছাড়া সুশাসন সম্ভব নয়? দেওয়ানী আদালতের ফাইলগুলো কি বকেয়া কাজে বোঝাই নয়? ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যাচার ও মামলার অস্তিত্ব কি নেই যা আমাদের বিচারের ত্রুটী প্রমাণ করে কিম্বা জনসাধারণের শোকাবহ নৈতিক অধোগতি সূচিত করে কিম্বা বস্তুত দুটোই করে। জনসাধারণের পক্ষে বোঝাস্বরূপ বেতন-ওয়ালা যে পুলিশ তাদের ছাড়া (আমাদের কাছে যেমন জনসাধারণের কাছেও তেমনি অবাক কাণ্ড) লুঠেরারা যারা এক সময় আমাদের অনেক জেলায় বিভীষিকা ছড়িয়েছিল তাদের সংগঠনকে বাধা দেওয়া যে অসম্ভব এটা কি সাধারণের ধারণা নয়? আমাদের দেশীয় প্রজাদের মধ্যে সাহস ও সদ্ভাবের অভাবে যে পুলিশ-প্রতিষ্ঠানগুলো অপরাধ নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভাবা হয় সেগুলি কি যে 'সম্প্রদায়-গুলির' সহায় ও যন্ত্র হওয়া তাদের উচিত ছিলো তাদের উপর যথেচ্ছা-চারী প্রভুত্ব করছে না? সমস্ত বিভাগে দেশীয় কর্মচারীরা কি দুর্নীতির ও বে-আইনী আদায়ের দোষে অপরাধী নয়? জমিদার ও তালুকদার কি প্রায়ই চাষীদের পেষণ করে না? জনসাধারণের মধ্যে এখনও কি ঘৃণার্হ বর্বরোচিত কতকগুলি আচার প্রচলিত নেই? প্রয়োজনের সময় আমরা কি সেই সহযোগিতা পাচ্ছি যা শাসকদের বিরোধী নয় এমন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শাসকদের পাওয়া উচিত? এ কি সত্য নয় আমরা সে সব শ্রেণীর বেশীরভাগ লোকদের বিরাগভাজন, যাঁরা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এবং দৃঢ় চরিত্র এবং যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারতেন? আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি আত্মোন্নতির বীজ আছে? এ কি দেখা যায়নি যে আমাদের সম্পত্তি যতো বাড়ছে সঙ্কটও ততো বেড়ে চলেছে? অর্থনৈতিক বিব্রত অবস্থার মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান খোলবার জন্যে আমাদের কি নিয়তই বলা হচ্ছে না যে প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যয়ের বোঝা আরো বাড়াবে? দেশের বেশীর ভাগ স্থানেই চাষ কি অত্যন্ত নীচু জাতের বলদ ও খারাপ বীজ দিয়ে নিপুণতাহীন ও উৎসাহহীন ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না? কারিগররা দুরবস্থায় নেই কি? ব্যবসায়িক

লেনদেন নিষ্প্রাণ এবং অজ্ঞতা-দুষ্ট নয় কি? ইয়োরোপীয়রা যে সব দ্রব্যের উন্নতি করেছেন তা ছাড়া এমন একটি উৎপাদিত দ্রব্য আছে কি যা অন্য দেশের একই রকম দ্রব্য থেকে অনেক নীচু স্তরের নয়? এবং এই পার্থক্য কি জমি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল? উৎপাদিত একটি প্রধান দ্রব্যের বদলে অন্য এক দ্রব্য উৎপাদন করলে লাভ হবে না এই যে আশঙ্কা সে আশঙ্কা করবার কি হেতু নেই? বিনিময়ে কিছু না পেলে লাভজনক কোনো ব্যবসা চলতে পারে না বিশেষ করে করদ রাজ্যের সঙ্গে—আর ভারত ইংলণ্ডের করদ রাজ্য। চাষী, শিল্পী ও বণিকরা কি অত্যধিক সুদ দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে না, যে অবস্থা ব্যবসার দুরবস্থার সঙ্গে দারিদ্র্য ও ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনার অভাব সূচিত করে? স্যর চার্লস্ মেটকাফের রিপোর্টে যা দেখানো হয়েছে, সেই আয় আদায়ের অসামর্থ্যের আসন্ন বিপদ কি নেই, যে আয় দেশরক্ষার ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠান রক্ষার্থে প্রয়োজন; রাস্তাঘাট, খাল, বিদ্যায়তন এবং অন্যান্য জন-উন্নয়নের কথা না-ই বা বলা হল।

আমার আশঙ্কা, এ সকল প্রশ্নের উত্তর এমন হবে, যাতে এইটেই বোঝাবে যে বর্তমান অবস্থা আদবেই এমন নয় যা নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি। যদি সরলতা ও সত্যের সহিত উত্তর দেওয়া হয়, তাহলে এটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে যে, প্রয়োজনীয় উন্নতি সম্ভবপর শুধু যদি আরো ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় ব্রিটিশ প্রজারা এদেশে বস-বাস করতে পারে এবং ভূসম্পত্তি পেতে তাদের বাধা না থাকে।

ইয়োরোপীয় কর্ম-নিপুণতা ও যন্ত্রপাতি ভারতের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—এর চেয়ে আর কোনো জোরালো যুক্তি বর্তমান প্রস্তাবের সপক্ষে বলা যায়না। ১৮২৮ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া হাউসের বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে প্রেরিত চিঠিতে দেখা যায় যে কম্পানী ঘোষণা করছে যে যন্ত্র-পরিচালিত তাঁতে তৈরী ব্রিটিশ দ্রব্য দামে সস্তা ও ভালো হওয়ায় তারা অবশেষে বাংলায় ও মাদ্রাজে তুলোর তৈরী জিনিসের যে ব্যবসাটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতী-বস্ত্র যা যুগ যুগ ধরে ভারতের প্রধান উৎপাদন ছিল তা চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতার জন্য জগৎ বিখ্যাত ঢাকাই

মসলিন একই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ; রেশমের ব্যবসাও অনুরূপ ধ্বংসের পথে। একই চিঠিতে কম্পানীর কোর্ট ইংলণ্ডে কাঁচা মালের কম দরের জন্য এবং ব্রিটিশের রেশম কুটিরশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এদেশে রেশমের দাম পড়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছে। বোর্ড অব ট্রেডের বিবরণীতে কম্পানীর কোর্টের সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে। এই বিবরণীতে বোর্ড বাণিজ্যিক বিপ্লবের যে তমসাচ্ছন্ন চিত্র দেখিয়েছে তার থেকে সুস্পষ্ট যে ইদানীং ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী কী ভাবে দুর্দশা-গ্রস্ত হয়েছে। এই চিত্র বাণিজ্যের ইতিহাসে বিরল।

ভারতের শিল্পজাত প্রাচীন দ্রব্যগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে যদি নতুন কোনো জিনিস তৈরী না হয় রপ্তানীর জন্যে তাহলে বাণিজ্য কী ভাবে চলবে এবং ইয়োরোপে ব্যক্তিগত বা সাধারণ হিসেবে টাকা জমা হবে কী করে? যদি স্বর্ণমানে বক্রী হিসেব মিটাতে হয় তাহলে শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন টাকার দুর্লভতার ফলে তার মূল্য বৃদ্ধি হবে আর তখন এখনকার পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা চলবে না। কাজেই সরকারের জরুরী কর্তব্য দেশের বিরাট উৎপাদন-শক্তিকে কাজে লাগাবার কোনো উপায়ই উপেক্ষা না করা—যে শক্তি উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এদেশীয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট থেকে এ বিষয়ে আমরা সাফল্য আশা করব কিনা এবং ইয়োরোপীয়দের উৎপাদন-নিপুণতা ব্যতিরেকে কখনো কোনো বৃহৎ উন্নতি সাধিত হয়েছে কি না।

যাঁরা ভারতীয় কারিগরদের দুর্দশার জন্যে আবেগের সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা এ জেনে সান্ত্বনা পাবেন যে সুদিনের আশা আছে—আশা এই যে তার প্রধান দ্রব্য বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের মুখ থেকে এখনো বাঁচান যেতে পারে।

মিঃ প্যাট্রিক নামে জনৈক ইংরাজ এসময়ে যন্ত্র দিয়ে সুতো পাকানোর একটি বৃহৎ কারখানা তৈরী করছেন, বাষ্প-চালিত যন্ত্রে তার কাজ হবে। এবং এই পত্রের উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুতি ঘটবেনা যদি বলা হয় যে এই বিরাট কারখানা তার নিজের ভূসম্পত্তির উপর গড়ে তোলা হচ্ছে, যে সম্পত্তি ওয়ারেন হেষ্টিংস্ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোনো সর্ত না রেখে

মঞ্জুর করেছেন। এ পর্যন্ত বাংলার তুলো স্থতো পাকানোর পক্ষে অযোগ্য গণ্য হতো কিন্তু সম্প্রতি যে উন্নত ধরনের তুলোর চাষ হচ্ছে—তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে হয়। উন্নত ধরনের তামাকেরও চাষ হচ্ছে যার মূল্য দেশীয় তামাকের দ্বিগুণ এবং যা আমেরিকার তামাকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। ভারতের বাণিজ্যিক দুর্যোগে কার কাছে ভারতবর্ষ বাণিজ্যের নব নব সম্ভাবনার জন্যে ঋণী? সগৌরব উত্তর হবে শুধু ইংরেজের কাছে। বাণিজ্য-সংসদের সহ-সভাপতিকে এই দুই দ্রব্যের নমুনা পাঠান হয়েছে।

ফলত বাস্তবক্ষেত্রে যারা এদেশে বসবাস করবে তাদের অবস্থা, চরিত্র ও স্বভাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে! এখন বিবেচনা করে দেখা যাক যে এবিষয়ে আশঙ্কার কতোটুকু সত্য ভিত্তি আছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে মফঃস্বলে অবস্থিত বহু নীলকর গর্হিত আচরণ করছেন, দেশীয়দের নির্যাতন করছেন এবং নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছেন। যদি অবস্থা সত্যি এমনই হত আমি তথাপি ভাবতাম যে তারা যে অদ্ভুত অবস্থায় আছে তার জন্যে অনেক কিছু মনে করা যেতে পারে। তারা অনেক কিছু এড়িয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে যার ফলে আইনসম্মত ভাবে তাদের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠা করতে কষ্ট হচ্ছে অথবা অগ্রিম মূল্য দিয়ে দরকারী মেশিনগুলি যোগাড় করবার যে নীতি চালু আছে সেই রেওয়াজ সমস্ত বাণিজ্যে এক বিব্রত অবস্থার স্থষ্টি করেছে এবং জাল জুচ্চোরির প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের প্রসার রোধ করবার যথেষ্ট উপায় তাদের নেই, দরিদ্র রায়তদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করবার পথ আরো অল্প। ভুললে চলবে না যে এ দেশের ইয়োরোপীয়-দের বসবাসের উপর যে বাধানিষেধ জারি হয়েছে, তাতে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের অভ্যন্তরে কার্য পরিচালনার জন্য এমন সব লোক নিযুক্ত করতে হয়, যাঁদের তাঁরা নিযুক্ত করতেন না যদি লোক পছন্দ করবার ক্ষেত্র ব্যাপক হোত। এটা আদবেই আশ্চর্যজনক মনে হবে না যদি এ অবস্থায় নানা অন্যায় চালু আছে দেখা যায়, মনে হয় যেন আইনের দুর্বলতা সত্য অথবা কাল্পনিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হিংসার ভাব জাগিয়ে তোলে। কিন্তু উল্লিখিত অসুবিধাগুলি থাকা সত্বেও আমার

অনুসন্ধানের ফলে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে (আমার আগেকার সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন) যে নীলকরদের কখন-সখনো দুর্ব্যবহার তারা যে কল্যাণ চারিদিকে বিতরণ করেছেন তার তুলনায় কিছুই না। অন্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও যেটা কচিৎ-কদাচিৎ ঘটে সেটা এমন মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে তাকে অবস্থার সাধারণ গতি বলে ভুল করা হয়েছে। শান্তি ভঙ্গের ব্যাপার স্বাভাবিকতই সাধারণের গোচরে আনা হয়, ব্যক্তি-গত দুর্ব্যবহারের উদাহরণ ভীষণ রং চড়িয়ে সকলের সামনে হাজির করা হয়, কিন্তু যে সব অসংখ্য নামহীন কাজ, নীরবে নিজেদের কাজ করতে ব্যস্ত, বিজ্ঞ ও সংযত ব্যক্তিরা জাতীয় সম্পদ এবং চারপাশের লোকদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলবার জন্যে করে চলেছেন সে সব কাজ গোচরে আসেনা এবং অজ্ঞাতই থাকে। নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের অনেক জেলায় কৃষির যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে তার কারণ নীলকরদের সেখানে বসতি। সাধারণ সত্য হিসেবে একথা বলা যায় যে (নৈতিকভাবে যে সাধারণ সত্য তৈরী তা ছাড়া) প্রত্যেক কারখানাই উন্নতি-বৃত্তের কেন্দ্র স্বরূপ। এই কেন্দ্র কারখানার কর্মচারীদের উন্নতি বিধান করে এবং আশেপাশের অধি-বাসীদের চারপাশে প্রচলিত অবস্থা থেকে উপরে নিয়ে যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপকারটা বড়ো হতে না পারে কিন্তু একটা উদার ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পদ্ধতি থেকে কী আশা করা যেতে পারে এই উপকার তা সহজেই দেখাতে পারে।

দূর-দেশে বেশি সংখ্যক শ্রমিক পাঠাবার যে অসুবিধে আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা না করেও আমি বলতে পারি যে যে-সব ইয়োরোপীয় একমাত্র তাঁদের শ্রম-শক্তিই বাজারে নিয়ে আসেন ভারতবর্ষ তাঁদের কোনো সুযোগ সুবিধে দিতে পারে না।

যে সুখসুবিধা তার জীবনধারণের পক্ষে দরকার তার বিধান করতে যে টাকা খরচ তাতে তার শ্রমের অনুপাতে দেশীয় শ্রমিকদের শ্রম অনেক বেশি খরিদ করা যেতে পারবে। দেশীয় শ্রমিকের তুলনামূলক মূল্যও বেড়ে যাবে কর্ম-নিপুণতা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে।

জাতীয় শিল্পের প্রধান শাখা এবং জনসাধারণ যার উপর নির্ভরশীল

সেই কৃষিতে শিল্পের মতো শ্রমিক সংখ্যা কমানো যায় না, বিশেষ করে যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টি সব জিনিসের উপর এতো প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সমস্ত জেলায় যে আবহাওয়া ইয়োরোপীয় কৃষকদের শুধু তত্ত্বাবধানের কাজে আবদ্ধ রাখে। শিল্পের সমস্ত শাখায় ইয়োরোপীয় মূলধন, উৎপাদন কৌশল এবং উদাহরণ ভারতের দরকার এবং ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও আছে। ইয়োরোপীয় শ্রমিকের চাহিদা নেই এবং তাদের ভরণ পোষণ করাও যাবে না। যারা বসতি স্থাপন করবে তাদের মূলধন ও উৎপাদন-নিপুণতা থাকা দরকার। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তারা সংখ্যায় খুব অল্পই হবে। শ্রমিক শ্রেণী এখানে বসতি স্থাপন করতে গেলে মারা যাবে। খামখেয়ালি ও বেপরোয়া কাজের কোনো সুযোগ নেই এখানে। যারা বসতি স্থাপন করেছে তাদের দখল স্থায়ী, সরকার ও আইনের অধীনে সম্পন্ন করতে হবে। উচ্চতর উৎপাদন-নিপুণতা ও শিল্পের জন্যে টাকা কর্জ করবার উন্নততর ব্যবস্থা—এই দুই ব্যবস্থা-পরিচালিত শিল্প দ্বারাই সম্পদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ডব্লিউ, সি, বেনটিংক

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিত লর্ড বেন্‌টিংক-এর এই রিপোর্টটি বিশেষভাবে তলিয়ে বোঝা দরকার। লর্ড বেন্‌টিংক অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থক ও ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের পক্ষপাতী। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি যে যুক্তিগুলি পেশ করেছিলেন কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে তাতে ইংরেজদের এদেশে বসবাসের যৌক্তিকতার সমর্থনে তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রথমত এদেশের লোকদের শিক্ষার জন্যে এটার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এদেশে জ্ঞান কখনো শিল্প-ক্ষেত্রে ও জীবনের অন্যক্ষেত্রে যথেষ্টভাবে কার্যকরী হবে না যদি ইয়োরোপীয়েরা তাদের আচরণ ও কাজ করবার ধরন প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ভারতীয়দের সামনে ধরে না দেয়। নিজেদের কাজের উদাহরণ দিয়েই এদের মধ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে, আর সেটি সম্ভব হতে পারে তখনি যখন ইয়োরোপীয়েরা এদেশে বসবাস করছে। দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপীয়দের এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বাসের আর একটা উপকারিতা আছে। আমাদের অফিসারেরা অপদার্থ, পুলিশ ঘুষখোর, জমিদারেরা চাষীদের পিষে-মারবার যন্ত্রস্বরূপ। বিপদের সময়

এদের উপর একেবারেই নির্ভর করা যায় না। ইয়োরোপীয়েরা দেশময় ছড়িয়ে বাস করলে তাদের উপর নির্ভর করা যাবে। তৃতীয়ত কৃষি-কার্য সেই পুরাতন প্রণালীতেই চল্‌ছে। ব্যবসা চল্‌ছে টিকিয়ে, কোনো তাগদ্ নেই তার। ভীষণ সুদের হারে ও দারিদ্র্যে দেশ নুয়ে পড়েছে। কি করে এই সব দূর করে এই দেশকে শিক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাস্তাঘাট তৈরী ব্যাপারে ও খালকাটা ব্যাপারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ইয়োরোপীয়দের জমিজমা কেনবার অধিকার দিয়ে এ দেশে বসবাস করতে দেওয়া। চতুর্থত এদেশে যে বিপুল উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত রয়েছে তাকে যদি সম্যক ভাবে জাগাতে হয় ও কাজে লাগাতে হয় তো সেটা ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া এদেশবাসীদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। মিঃ প্যাট্রিক, একজন ইংরেজ, তাঁর জমিদারীতে প্রকাণ্ড কারখানা বসাচ্ছেন কল দিয়ে সুতো তৈরীর জন্যে। ভালো জাতের তামাকও উৎপন্ন করা হয়েছে ইয়োরোপীয়দের দ্বারা।

এদেশে ইয়োরোপীয়দের জমিজমা কিনে বসবাস করতে দেওয়ার সমর্থনে এই যুক্তিগুলি দেখিয়ে লর্ড বেন্‌টিংক গ্রামাঞ্চলে চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের যে সব খবর তখন বের হচ্ছিল সংবাদপত্রে সেগুলির যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ধরনের অত্যাচার যে ঘটেছে সেটা তিনি আদবেই অস্বীকার করেন নি। শুধু কয়েকটি ঘটনা থেকে সব নীলকর সাহেবদের একই দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যে যুক্তিযুক্ত নয় সেকথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন—"যে অবস্থায় অত্যাচার হয়েছে, আইন ভঙ্গ করা হয়েছে, সেই অবস্থায় এ সব না ঘটলেই আশ্চর্য হতুম। কিন্তু সে সব অসুবিধে সত্ত্বেও আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নীলকরেরা যে উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যেমন অন্যক্ষেত্রে তেমনি এক্ষেত্রেও বিরল ঘটনাগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যার ফলে এই বিরল ঘটনাগুলিকে সাধারণ ঘটনার নমুনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শান্তি ভঙ্গের উদাহরণগুলি জনসাধারণের সামনে ধরে দেওয়া হয়েছে, কতকগুলি ব্যক্তির দুর্ব্যবহার খুব বাড়িয়ে রঙচঙ করে দেখান হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য অজ্ঞাত কর্ম যা দিয়ে শান্তিকামী ধীর ও স্থির লোকেরা জাতীয়

ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে ও আশপাশের লোকদের কল্যাণসাধন করেছে, সেগুলি অজ্ঞাত থেকে গেছে। কৃষি-ব্যাপারে জেলাগুলিতে যা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই সেখানকার নীলকরদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। সাধারণ-ভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক নীল-কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে সব লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদের ও আশপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করে নীলের কারখানা।”

এই লাইনগুলি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে স্মরণ করায়। লর্ড বেন্‌টিংকের অনেক আগে থেকেই দ্বারকানাথ নীলকর সাহেবদের দ্বারা গ্রামের চাষীদের কি কল্যাণ সাধিত হয়েছে সে কথা পত্রিকা মারফৎ দেশবাসীদের জানিয়েছেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে লর্ড বেন্‌টিংকের বন্ধুত্ব ছিলো। এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সব ব্যাপারেই বেন্‌টিংক রামমোহন রায়ের ও দ্বারকানাথের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর লেডী বেন্‌টিংক দ্বারকানাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে লেখেন :

> একটি উপায় উদ্ভাবন করতে যে অংশ আপনি গ্রহণ করেছেন, যার উপর প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেলের হৃদয়-মন গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিল, আমি আনন্দের সহিত বলছি, কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গীয় রামমোহন রায় এবং আপনিই এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন।

—তাই গ্রামাঞ্চলে নীলকুটির পত্তন হওয়াতে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা বেন্‌টিংক নিশ্চয়ই দ্বারকানাথের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথের উক্তিগুলির সঙ্গে বেন্‌টিংকের মন্তব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য সেইটেই প্রমাণ করে।

ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথাই সেদিন বিপক্ষ দলের সবচেয়ে বড়ো যুক্তি ছিলো। সে যুক্তি যে অত্যাচারের অতিরঞ্জিত কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও যেখানে যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যে নীলের চাষ নেই এমন সব এলাকার চাষীদের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থায় অনেক উন্নত সেই তথ্যটি ইয়োরোপীয়দের জমি কেনার ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসের বিরোধী বাংলার জমিদারেরা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ও বেন্‌টিংক

এদের সেই অসাধু প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেন প্রকৃত অবস্থার কথা জনসাধারণের সামনে হাজির করে। তারপরে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন বেন্‌টিংক তাঁর রিপোর্টে। কোন ইয়োরোপীয়দের তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করতে দিতে চান? ইংরেজ মজুর ও চাষী দলে দলে এসে এদেশে বসবাস করুক এইটেই কি তিনি চাচ্ছিলেন? লর্ড বেন্‌টিংক সেটা আদবেই চান নি। তাঁর রিপোর্টে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "ইয়োরোপীয় মজুর শ্রেণীর লোকদের চাই না। যারা এখানে বসবাস করতে আসবে তারা মূলধনের মালিক হবে আর তাদের কর্মকুশলতা থাকবে। এদেশের লোকের তুলনায় তারা তাই সংখ্যায় অল্প হবে।"

তাঁর উদ্দেশ্যটি জল্‌জ্বল্ করে ফুটে বের হচ্ছে এই কথাগুলি থেকে। ইয়োরোপীয়দের মূলধনের ও কর্মকুশলতার সাহায্যে এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংকীর্ণ পরিধি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। বেন্‌টিংকের দুই বন্ধু—রামমোহন ও দ্বারকানাথ—তাঁদেরও এই একই উদ্দেশ্য ছিলো। জমিদারী ব্যবস্থার কঠিন বাঁধনে-বাঁধা চাষীদের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা ছিলো না। সেই বাঁধন কাটবার জন্যে মূলধন-ওয়ালা কর্মকুশলী কিছু ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বাস করে নতুন নতুন ফসলের চাষের সূত্রপাত করা ছাড়া সেদিনের রাজনৈতিক অবস্থায় আর অন্য কোনো পথ ছিলো না। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও বেন্‌টিংক, এই তিনজনেরই উদ্দেশ্য ছিলো তাই—জমিদারী প্রথার বাঁধ-দেওয়া গ্রামের বদ্ধ জলে নতুন অর্থনৈতিক জোয়ার বইয়ে দেওয়া। এই জোয়ার বইলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হবে গ্রামে এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ এঁদের দুজনের মধ্যে কেহই অগুন্‌তি ইয়োরোপীয়দের এই দেশে বসবাস চান নি। অন্য সব বিষয়ের মতো এ বিষয়েও এঁদের বন্ধু বেন্‌টিংক এঁদের মতামত জেনে তাঁর মত পেশ করে থাকবেন কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে।

মে মাসের শেষে বেন্‌টিংকের এই রিপোর্ট গেলো ইংলণ্ডে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে, তার বারো-তেরো দিন পরেই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ও ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাস-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন প্রকাশিত হোলো "বেঙ্গল হেরল্ড্" পত্রিকায়। প্রবন্ধটি

তথ্যপূর্ণ, তাই মূল্যবান। তখনকার অবস্থা বুঝতে এটি সাহায্য করে। প্রবন্ধটি এই—

ভারতের সভ্যতার জন্য উপনিবেশ স্থাপন একটি প্রকৃষ্টতম উপায়—স্যার জন ম্যাল্‌কম্।

সন্দেহ নেই যে কলকাতার এবং বাংলাদেশেব সম্পদ বৃদ্ধি গত কয়েক বছরে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং স্বভাবতই এই বৃদ্ধির কারণ কি সে বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি।

জমির মূল্য এই সম্পদবৃদ্ধির প্রথম কারণ এবং বাণিজ্যের উপর বাধা-নিষেধের হ্রাস এবং ইয়োরোপীয়দের অধিক পরিমাণে আসতে দেওয়ার সুযোগদান—এই হিতকর পরিবর্তনের প্রধান কারণ। এই বক্তব্য প্রমাণিত করবার জন্যে বহু তথ্য উপস্থিত করা যায়। নিজের কথা তারা নিজেরাই বলবে—ভূমিকার প্রয়োজন নেই। ত্রিশ বছর আগে কলকাতায় জমি পনেরো টাকায় খরিদ হয়েছে এখন তার মূল্য এবং তার বিক্রয় দর তিন শ টাকা। এমনি আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। জমির এই মূল্যের দরুণ সমাজে এক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এই শ্রেণী অভিজাত ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং নিয়তই প্রভাবশালী শ্রেণী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের জন্মের আগে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ছিল এবং আর সবাই তাদেরই উপর নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের বেশির ভাগ অপরিসীম মানসিক ও দৈহিক দারিদ্র্যের অবস্থায় ছিল তাই হিন্দুর ব্যাপক নৈতিক বন্ধনের যথার্থ কারণ, ধর্ম ও আবহাওয়ার যে অজুহাত দেখানো হয় তা নয়।

পরিবর্তনে যে সুবিধা হবে তা অপরিমেয়, শুধু হিন্দুদের বিষয়েই নয়, ব্রিটিশের ভারত-সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্বও প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা নূতন যুগের উষাকাল হয়ে দেখা দেবে। যখনই এই ধরণের মানুষ সমাজে সৃষ্টি হয়েছে তখনই স্বাধীনতা দেখা দিয়েছে। উদাহরণের প্রয়োজন আছে কি? নর্মান-বিজয়ের পর ইংলণ্ডকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে সেখানে জনসাধারণ দাসের সামিল ছিল, এবং এদেশের জমিদাররা যেভাবে কয়েক বছর পূর্বে থাকতেন—সেখানেও ভূসম্পত্তি-ওয়ালারা সেভাবেই থাকতেন। কিন্তু অষ্টম হেনরী পর্যন্ত তাদের প্রগতি

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সম্পত্তি অনেকটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই অবস্থাই চলেছে যতদিন না এক কসাইর ছেলে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ও তার গর্দান নিয়ে ইংলণ্ডের গণতন্ত্র রাষ্ট্রকে জগতের ভয় ও প্রশংসার পাত্র করে তুলেছিল।

দেশে মাত্র দুটি স্তর থাকার দুর্ভাগ্যের উদাহরণের দরকার আছে কি? স্পেনের দিকে তাকান। সেখানে যে পারে সে কোনো প্রকার দৈহিক বা মানসিক শ্রম না করেই বসবাস করে এবং হিডালগোর মর্যাদা দাবী করে। আরো দূরে যাবার দরকার আছে কি? দুঃস্থ পোল্যাণ্ডের দিকে তাকান, সেখানে জমির সঙ্গে চাষীও বিক্রয় হয়। এমন অনেক উদাহরণ সম্মুখে রেখে এ কথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবেনা বাংলাদেশের অধিবাসী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে সব চাইতে আশাপ্রদ ইঙ্গিত বহন করছে।

এই নূতন পরিবেশ হতে যে সুফল পাওয়া যাচ্ছে তা হল মুদ্রার বহুল চলমানতা। তার প্রমাণ দরকার। প্রথমত কলকাতায় কড়ির প্রচলন আর নেই বল্লেই চলে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলাদেশেও তা কচিৎ দেখা যাবে। দশবছর আগে একজন মজুর মাসিক দু'টাকা পেত এখন সে চার পাঁচ টাকার কমে খুশী নয় এবং কাজ করবার লোকের অভাব হচ্ছে। একজন ছুতোর আগে মাসিক আট টাকা পেতো এখন সে মাসে ষোল থেকে কুড়ি টাকা পায়। দেশে মজুরের মজুরীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে বারোজন কৃষি-মজুর দিনে একটাকায় পাওয়া যেতো এখন সে টাকায় মাত্র ছয় জন মজুর পাওয়া যায়। ধান জমি বিঘা প্রতি এক টাকা খাজনায় চষতে দেওয়া হত এখন জমিদার প্রজা থেকে বিঘা প্রতি তিন চার টাকা খাজনা চান। চাল বিক্রী হত আট আনা মণ এখন তা গড়ে দুটাকা মণ বিক্রি হয়। একটি জেলার সব জমিদারিই এখন আবাদ হয়, আগে অর্দ্ধেকও আবাদ হত না। নীল-চাষের ফলেই তা হয়েছে।

এই পরিবর্তনের কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। মনে হয় এটা দেখান যেতে পারবে যে অবাধ বাণিজ্য এবং নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ইয়োরোপীয়দের এদেশে যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে—এই দুটিই

পরিবর্তনের আসল কারণ। কেন না ১৮১৩-র সনদের আগে দেশের অবস্থার ততো উন্নতির চিহ্ন দেখা যায় না যতোটা পরে দেখা যায়। অনিষ্টকর একচেটিয়া বাণিজ্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা খর্ব করেছে এবং তার বিপুল বিস্তারের দ্বারা অনেককে ব্যবসা করতে বাধা দিয়েছে যা পরে লাভ-জনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইয়োরোপীয়দের আগমন নীল উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে যা তাদের পক্ষে উপকারী হয়েছে, ইংলণ্ড ও ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে এবং ভারতের জমির ও আবহাওয়ার শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

লিভারপুল ও গ্লাসগোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলে থাকেন, তাঁদের সপক্ষের যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলেন যে ভারতের বাজার ইংরেজদের তৈরী দ্রব্যে ভরে গেছে এবং যারা তা রপ্তানী করেছে তাদের অশেষ দুর্গতি হয়েছে। সমস্ত পরিবর্তনেই এই ঘটনা দেখা যায় এবং তা অশেষ সুফলপ্রসূ। দ্রব্যের সস্তা দাম ক্রেতাকে প্রলোভিত করে এবং পূর্বে অজ্ঞাত একটা রুচিও তাতে তৈরী হয় এবং দ্রব্যগুলো একটা বাঁধা দরে পৌঁছুলে সে রুচি তৃপ্ত হতে থাকে। তার ফলে নূতন আমদানী উৎসাহিত করা হয় এবং তাতে যোগানদার ও ক্রেতা উভয়ের সুখই বর্ধিত হয়। এটা অবিশ্যি পরিষ্কার যে এই অবস্থায় উভয় দিক হতে বাণিজ্য চালু হওয়া উচিত এবং যদি ইংলণ্ড আশা করে যে ভারত তার উৎপন্ন দ্রব্যের একটি প্রশস্ত বাজার হবে তবে তাকে এশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে যে উচ্চ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে এবং যা একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে লজ্জাকর, তা অপসারিত করতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে একমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীই, ভারত থেকে বার্ষিক চার মিলিয়ন ষ্টার্লিং স্বর্ণমুদ্রা তুলে নেয়—তার থেকে দুই মিলিয়নেরও বেশি অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়া হয় এবং বাকিটা দেশে তাদের প্রতিষ্ঠানের খরচ বাবদ যায়।

আমরা দেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা নিজেদের ভূসম্পত্তির চড়া দামে বিস্মিত। যখন এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁরা বলেন ইয়োরোপীয় মাল, ইয়োরোপীয় কর্ম-কুশলতা ও উৎপাদন শক্তি আমদানী হওয়াতেই তা হয়েছে। যদি এ

ফল পাওয়া এখনই গিয়ে থাকে তবে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের চিনির শুল্ক সমান করে যন্ত্র আমদানী করে এবং ইয়োরোপীয়দের বিতাড়িত করবার ভয় তিরোহিত করে, যা স্বাধীনতা-সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তির নিকটই গর্হিত, কি সুফলই না আশা করা যেতে পারে!

অবাধ বাণিজ্যে যে সুফল পাওয়া যায়, লিভারপুল তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ; এবং আজকের দিনে আমাদের ইয়োরোপীয় বিভাগে জাহাজের তালিকা পাওয়া যাবে, যে তালিকা থেকে দেখা যাবে যে লিভারপুলের বৃহৎ ডকে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছে সেই জাহাজের সংখ্যা গ্রেট ব্রিটেনের যে কোনো বন্দরের জাহাজ সংখ্যা থেকে অধিক। এই জাহাজগুলি থেকে যে আয় হয় তার থেকে একশ বাইশ হাজার পাউণ্ড সহরের প্রসার ও উন্নতির জন্য খরচ হয়।

স্বর্গত বিশপ হেবারের রচনা এখানে ব্রিটনদের অবাধ প্রবেশের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এমন কি এই সহৃদয় বিশপও অনিচ্ছা সত্বেও এদেশে বৃটনদের অবাধ প্রবেশের অনুকূলে খুবই সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'বর্ণনা'র পাঠকরা যদি নজর করেন তা হ'লে দেখবেন যে তিনি প্রায়শঃই রোজনামচাতে বলেছেন— "দেশের চেহারা উন্নত এবং দেশবাসীকে সমৃদ্ধ ও সুখী মনে হয়—আজ অনেক নীলের কারখানা দেখলাম।" এই বক্তব্যের পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের সূত্র ধরিয়ে দেয়।"

"বেঙ্গল হেরল্‌ড্"-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লেখকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ইতিহাসের জ্ঞান ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দেয়। বাংলা দেশে যে একটা পরিবর্তন এসেছে কয়েক বছরের মধ্যে সেটা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেশ পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কলকাতার জমির দাম পনেরো টাকা থেকে তিনশো টাকা হয়েছে। মজুরেরা মাসে দুটাকা মাইনে পেলে ভাগ্য মনে করতো, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অন্তত চার-পাঁচ টাকা না পেলে তারা খুসি নয়। টেবিল চৌকি তৈরী করে যে ছুতোরেরা আগে মাসে আট টাকা পেতো, এখন তারা খুব কম করে ষোল টাকা থেকে কুড়ি টাকা দাবী করে। ক্ষেত-মজুরের বেলাতেও পরিবর্তন চোখে পড়বার মতো। আগে এক-টাকায় বারোজন ক্ষেত-মজুর পাওয়া যেতো, ১৮২৯ সালে তার জায়গায় এক-টাকায় ছ জন

ক্ষেত-মজুর পাওয়া যায়। আগে এক বিঘে ধেনো জমি এক টাকা খাজনায় পাওয়া যেতো, লেখকের মতে সেই জমি তখন তিন-চার টাকা খাজনায় পাওয়া যাচ্ছে। চালের দাম আট আনা মণ থেকে দু টাকা মণ হয়েছে। আগে জেলার অর্ধেক জমি অনাবাদী পড়ে থাকতো, নীল-চাষের ফলে জেলার প্রায় অধিকাংশ জমি চাষে এসেছে। এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "একটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, আগে যার কোনো পাত্তা ছিলো না। অভিজাত সম্প্রদায় আর গরীব, এই দুয়ের মধ্যে এদের স্থান, আর এরা উত্তরোত্তর একটি শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে উঠছে। এদের উদ্ভবের আগে দেশের ঐশ্বর্য অল্প কিছু লোকের হাতে ছিলো, এই কতিপয় লোকদের উপরে আর সকলে নির্ভর করতো। বেশীর ভাগ লোক কায়িক ও মানসিক দারিদ্র্যে ডুবে ছিলো।"

এই ভাবে লেখক বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর ক্ষমতালাভের ইতিহাস আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর মতে দেশের এই চমকপ্রদ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার ফলস্বরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, এই দুই-ই সম্ভব হয়েছে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়ার ফলে। যতদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হোতো না ততদিন এই উন্নতির লেশমাত্র চিহ্ন ছিলো না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারের ফলে যখন ইয়োরোপীয়দের কিছুটা সুবিধে দেওয়া হোলো এ দেশে এসে বাণিজ্য করবার ও জমি কিনে চাষবাস করবার তখন থেকেই এই উন্নতির সূত্রপাত হোলো। ইয়োরোপীয়েরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস সুরু করায় নীলের চাষ আরম্ভ হোলো আর তার ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ দুই-ই লাভবান হলো। লেখক ইংরেজ, তবু বলতেই হবে যে তিনি কপট নন, শুধু ভারতবর্ষ আর্থিক লাভ করলো আর ইংলণ্ড পরমার্থিক লাভ করলো, এরকম মিথ্যে কপটতার ধার দিয়েও তিনি যাননি। তারপরে তিনি বলছেন যে অনেকে খুব হৈচৈ সুরু করেছেন যে লিভারপুল আর গ্লাসগো থেকে প্রভূত মাল এখানকার বাজারে আসায় বাজার মালে ভর্তি হয়ে গেছে, তার ফলে জিনিসের দাম কম হয়ে গেছে আর

যারা মাল আমদানী করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লেখক এর উপর মন্তব্য করে বলছেন যে—"যেখানেই এই পরিবর্তন সাধিত হয় (অর্থাৎ কিনা বাজারের উপর একচেটিয়া ব্যবসাদারদের দখল ভেঙ্গে সব ব্যবসাদারদের মাল আনবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়—সৌম্যেন্দ্রনাথ) সেখানেই এই রকম ঘটে অর্থাৎ মাল-আমদানী-করনেওয়ালারা গোড়ায় গোড়ায় লোকসান খায়। কিন্তু এই পরিবর্তন খুব ভালো হিতকর ফল দেয়। জিনিসের দাম সস্তা হোলে বেশী খরিদ্দার এসে জোটে। পূর্বে জিনিস সম্বন্ধে যে রুচি ছিলো না, সে রুচি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। জিনিসগুলির একটা বাঁধা দাম আস্তে আস্তে নির্ধারিত হয়ে যায়, তাই নতুন রুচিও পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে আরো নতুন নতুন জিনিসের আমদানী হতে থাকে।"

লেখক এমনি সোজা করে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির (Free Trade-এর) সুফল বর্ণনা করেছেন। ক্যাপিটালিজ্‌মের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্যে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ছিলো সেদিন একমাত্র নীতি। একচেটিয়া বাণিজ্যের শিকলে আট্‌কে পড়ে ক্যাপিটালিজম্‌ এগোতে পারছিলো না। নতুন নতুন জিনিস তৈরী হওয়া সম্ভব ছিলো না সেই অবস্থায়। জিনিসগুলির দাম কমবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না ক্যাপিটালিজমের আওতায়। সাগরের এপার ওপার দু পারেই তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির জোর লড়াই চলতে লাগলো।

গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করতে দেওয়া হোক, ব্যবসার জন্যে এই দাবী জানিয়ে গভর্মেণ্টের কাছে কলকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা যে মেমোরিয়াল পাঠিয়েছিলেন, গভর্মেণ্ট তাঁদের ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সেই মেমোরিয়াল প্রস্তাবসহ কোর্ট অব ডিরেক্টরদের কাছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তাঁদের ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখের চিঠি মারফৎ নির্দেশ পাঠালেন যে 'যা কিছু আইনকানুন এতো দিন চলে আস্‌ছে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কেনা সম্বন্ধে, সে নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চল্‌তে হবে।' কোর্ট অব ডিরেক্টরদের এই নির্দেশের ফলে গভর্মেণ্টের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলো।

কোর্ট অব ডিরেক্টরদের এই নির্দেশের প্রতিবাদ করবার জন্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে টাউন হলে একটি প্রতিবাদ-সভা ডাকা হোলো। সেই সভায় অগ্রণীর অংশ গ্রহণ করলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সেই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এই প্রস্তাবটি আনলেন—'ব্রিটিশ প্রজারা জমি দখল করতে পারবে ও জমি খরিদ করতে পারবে—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে এবং কম্পানী-শাসিত এলাকার মধ্যে স্বাধীনভাবে ও অবাধে বসবাস করতে পারবে—এর বিরুদ্ধে যে আইন আছে, সেই আইনগুলি ব্যবসার উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি ও তৈরী মাল উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির আইনগত বাধা সৃষ্টি করেছে, এই বিবেচনা করে এই সভা যে আর্জি পার্লামেণ্টের কাছে পাঠিয়েছেন যে ব্রিটিশ প্রজাদের ভারতবর্ষে আসার ও বসবাস করার বিষয়ে যে সব আইনগত বাধা আছে সেগুলি দূর করা হোক, কেন না এই বাধাগুলি এদেশের বাণিজ্যের উন্নতির পরিপন্থী,—সেই আর্জির সমর্থন করছে।'*

এই প্রস্তাবের সমর্থনে দ্বারকানাথ বললেন,—"নীলের চাষ ও ইয়োরোপীয়দের বসবাস দেশের ও দেশের সব শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। জমিদারেরা ধনী হয়েছেন ও উন্নতি করেছেন, চাষীদের অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। যে সব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই সে সব জায়গায় অধিবাসীদের চেয়ে এদের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। নীলের চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গার জমির দাম বেড়ে গেছে ও চাষবাসেরও খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে। যদিমাত্র একটি জিনিস তৈরী করতে ইয়োরোপীয়দের যে কর্মকুশলতা ও উৎপাদন-নৈপুণ্য আছে তার ব্যবহারে এতো উপকার সাধিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো যে সব জিনিস এদেশে উৎপন্ন হতে পারে সেই সব জিনিসের উৎপাদনে ইংরেজদের কর্ম-নৈপুণ্যের, মূলধনের ও পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে

*"That this meeting considering one of the main legal obstructions to the commercial, agricultural and manufacturing improvements to consist in the obstacles which are opposed to the occupancy or acquisition of land by British subjects, and against their free resort to and unmolested residence within the limit of the Company's administration, does approve and confirm."

আমরা আরো কতো না উন্নতি করতে'পারি। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মতো আমাদের দেশ যে সব উৎকৃষ্ট জাতের জিনিস প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে সেগুলির উৎপাদন ইয়োরোপীয়দের অবাধ সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।"*

এই প্রস্তাব সমর্থন করে রামমোহন রায় বললেন—'যে প্রস্তাবটি এখুনি পড়া হোলো তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুর যা বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। নীলকরদের সম্বন্ধে আমি বল্‌তে পারি যে বাংলা ও বেহারের কয়েকটি জেলায় নীলকুটিগুলির কাছাকাছি অঞ্চলে আমি ঘুরেছি। আমি দেখেছি যে নীলকুটির আশেপাশের বাসিন্দেরা নীলকুটি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ও ভালো অবস্থায় বাস করে। নীলকররা আংশিকভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্তু সব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে সরকারী ও বে-সরকারী সব শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের চেয়ে এই নীলকরেরা এদেশের সাধারণ লোকের অনেক বেশী উপকার করেছে!'†

---

*I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefited the country and the community at large, the Zamindars becoming wealthy and prosperous, the Ryots materially improved in their condition and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced and cultivation rapidly progressing. . . . If such beneficial effects as these I have enumerated, have accrued from bestowing European skill in one article of production alone, what further advantages may not be anticipated from the unrestricted application of British skill, capital, and industry to the very many articles which this country is capable of producing, to as great an extent, and of as excellent a quality, as any other in the world, and which of course can not be expected to be produced without the free recourse of the European."

†I fully agree with Dwarkanath Tagore, in the support of the resolution just read. As to the Indigo planters I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Bihar and I found the natives residing in the neighbourhood of Indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the Indigo planters, but on the whole, they performed more good to the generality of the natives of this country, than any other class of Europeans, whether in or out of the Service".

প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। এই প্রস্তাব তখন সভার সকলের সমর্থন লাভ করে।

রামমোহনের ও দ্বারকানাথের বক্তৃতা দুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যাতে ইয়োরোপীয়দের মূলধন ও নৈপুণ্য ব্যবহার করে এদেশে নানা ধরণের কারখানার পত্তন হয় ও কৃষির উন্নতিসাধন করা যায়—এই ছিলো তাঁদের প্রাণের ইচ্ছে। ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া যে এ দুটি কাজ সম্ভব নয় এ বোধ ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন এই অসাধারণ মানুষদুটির ছিলো।

পনেরোই ডিসেম্বর এই মিটিং হয়ে গেলো, তার দুদিন পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ডিসেম্বর কলিকাতার নাগরিকেরা ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের সমর্থন করে একটি দরখাস্ত পাঠালেন পার্লামেণ্টের কাছে। সেই দরখাস্তে তাঁরা বললেন—

> আপনার নিকট আবেদনকারীরা—কলকাতার ব্রিটিশ এবং দেশীয় অধিবাসীরা ভারতের বাণিজ্যিক ও চাষের সম্পদে ব্রিটিশ উৎপাদন নিপুণতা মূলধন ও যন্ত্রশিল্প প্রয়োগের আইনত সব বাধা অপসারিত করে যে স্বার্থে ও প্রীতিতে দুই দেশকে সংযুক্ত করছে তা নিকটতর ও বর্ধিত করবার জন্য ব্যগ্র। এই বাধাগুলি জাতীয় উন্নতির পক্ষে যেমন খাপছাড়া তেমনি যে আইনে উপনিবেশ ও ব্রিটিশের অধীনস্থ দেশগুলো শাসিত হচ্ছে তার বিরোধী। আপনাদের মাননীয় পার্লামেণ্ট সর্বকালের ও সর্বদেশের সমান অভিজ্ঞতার ফলে নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো সরকার একচেটিয়া বাণিজ্যের অন্যায় সুবিধা ছাড়া লাভজনক ভাবে ব্যবসা করতে পারে না। তাছাড়া গভর্মেণ্ট ও বণিকেরা যদি একই বাণিজ্যে রত হন তাহলে দেশের রাজস্বের অপচয়ের কারণ তো ঘটবেই উপরন্তু তা ব্যক্তি বিশেষের বাণিজ্য কার্যের সঙ্গে অসম সংঘর্ষে ও ক্ষতিমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতে যে বাণিজ্য করছে এসব আপত্তি তার প্রতি প্রযোজ্য এবং যেহেতু কম্পানী এদেশে শাসন কাজ চালাচ্ছে সেই হেতু যে কটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কম্পানী এখনো দখলে রেখেছে সেগুলি কম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে। কম্পানীর হাতে চায়ের একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় তারফলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন যে কি পরিমাণ সংকুচিত হয়েছে এবং চায়ের মূল্য বৃদ্ধি করেছে তা

আপনাদের পার্লামেণ্টে সুবিদিত। তাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বাণিজ্য অবাধ থাকলে প্রত্যক্ষ করে যতো না দিত পরোক্ষ করে তার দ্বিগুণ দিচ্ছে। এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মূলধন (যার ডিভিডেণ্ড খরিদ্দাররা যে মাল খরিদ করে তার দাম চড়িয়ে দেওয়া হয়) জাতীয় ঋণে সংযুক্ত হচ্ছে। যে সব যাহাজে ইংলণ্ডে চা আমদানী হত তাদের কতকগুলিতে ইংলণ্ডে চা আমদানী হয় আর কিছুতে বাইরের মাল এদেশে আসে। বর্তমান মাল চালান দেবার সঙ্কট দেখা দিচ্ছে কিন্তু দুই দেশেরই সম্পদ ও সুবিধা একচেটিয়া বাণিজ্য থাকার জন্যে প্রতিহত হচ্ছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বাণিজ্যের অধিকার রদ করে দেওয়ার দাবী জানানোর জন্যেই স্বাধীন ব্যবসায়ীদের এই দরখাস্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অক্টোপাসের মতো গুচ্ছের হাত বের করে এমন করে এদেশের বাণিজ্য দখল করে বসেছিল যে কারো সেখানে হাত বাড়াবার উপায় ছিলো না। নানা রকম আইনকানুন তৈরী করে অন্য ব্যবসায়ীদের এদেশে এসে ব্যবসা করবার সব পথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী দিয়েছিলো বন্ধ করে। সেই একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবসার অবাধ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ব্যবসায়ীরা একটানা লড়াই করে চলেছিলো। শাসকশ্রেণী যেমন আইনের সাহায্য নিয়ে নিজ শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখে, অন্য শ্রেণীগুলিও তেম্‌নি নীতির দোহাই পেড়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পুষ্ট করতে চায়। এই দুই শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে-পেছিয়ে এগিয়ে চলে। জিনিসের যা দাম হোতো বাণিজ্যের অধিকার সকলের থাকলে, একচেটিয়া ব্যবসা-ব্যবস্থা যে কেমন বেপরোয়াভাবে তার চেয়ে দ্বিগুণ দাম আদায় করে জনসাধারণের কাছ থেকে, তার উদাহরণ স্বরূপ চীন দেশের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর যে চায়ের ব্যবসা ছিলো সেই ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হোলো এই দরখাস্তে। অবাধ বাণিজ্য চলন থাকলে যে দাম দিতে হোতো, চীনের সঙ্গে চা-ব্যবসায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকায় ইংলণ্ডের লোকদের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তার দু'গুণের বেশী দাম আদায় করছিলো। একচেটিয়া বাণিজ্য-ব্যবস্থার এই হোলো দোষ। না দেয় তা নতুন নতুন কল-কারখানা গড়তে, নতুন নতুন জিনিস তৈরী করতে, না দেয় তা জিনিসের দাম

কমাতে। একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের দোসর।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখের টাউনহলের মিটিংয়ের সম্বন্ধে ও এদেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মন্তব্য ছাপা হল—

> লক্ষ্য করবার আরেকটি প্রধান বিষয় হল টাউনহলের সভায় কম্পানীর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে নিন্দাবাদ পেয়েছে সেই নিন্দাবাদ। দেশের সর্বময় কর্তা হিসেবে কম্পানা এই দেশে থেকে যে খাজনা পায় তার বেশির ভাগ ভারতে ব্যবহৃত হয় ও ভারত থেকে রপ্তানী করা হয় এমন সব বিভিন্ন মাল তৈরিতে নিযুক্ত হয়। সভার অভিমতে এইরূপ অর্থ বিনিয়োগ ব্যক্তিবিশেষের শিল্প প্রচেষ্টার বাধাস্বরূপ এবং সুশাসনের ও উন্নতির বিরোধী।···এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারতে কম্পানীর বাণিজ্যিক লেনদেনের শাখা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হক। এই বিরাট দেশের শাসকগণ···লবণের একচেটিয়া প্রস্তুতকারক, যে সবচেয়ে চড়া দাম দেয় তার কাছেই লবণ বিক্রি করা হয়। আফিং-এরও একচেটিয়া প্রস্তুতকারক তারা। তারা রেশম প্রস্তুত করে এবং চড়া দামের দরুন এবং অনেক সুবিধা ভোগের দরুন তারা এ ক্ষেত্র হতে বেসরকারী প্রস্তুতকারকদের বিতাড়িত করেছে।
>
> তারা ব্যবসায়ী, নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে জাহাজে ইংলণ্ড থেকে ভারতে এবং ইংলণ্ডে ভারত থেকে এবং ভারতে চীন থেকে এবং চীনে ইংলণ্ড থেকে মাল নেবার ব্যবসা করে। তারা জাহাজে মাল বহন করবার দালাল···এইভাবে অন্যায় ও অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতাদ্বারা তারা প্রায় প্রত্যেক শিল্প-শাখাতেই মাথা গলিয়ে থাকে এবং সরকারী ও বেসরকারী উন্নতি প্রতিহত করছে। কলকাতার জনসাধারণ সঙ্কল্প করেছে সর্বজনস্বীকৃত অন্যায়ের প্রতিকার করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সর্বেসর্বা উৎপাদকদের, বণিকদের ও দালালদের বর্বর পদ্ধতি নির্মূল করা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কেন বাণিজ্যের অবাধ অধিকারনীতির এত ঘোর বিরোধী ছিল তা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য নির্মমভাবে

ফাঁস করে দিল। নুনের একচেটিয়া ব্যবসা কম্পানীর হাতে ছিল, তাই সবচেয়ে বেশী দাম যে দিত তাকে নুনের ইজারা দেওয়া হত। তার ফলে নুনের দাম তার যথার্থ দাম থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজার গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হত। আফিং আর রেশমী কাপড়—এই দুয়ের উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিল কম্পানীর। তার ফলে এ দেশের লোকদের আফিং খাইয়ে আর রেশমী কাপড়ের দাম খুশি মত বাড়িয়ে কম্পানী অঢেল টাকা লুটছিল। সাধে কি অবাধ-বাণিজ্যের দাবী উঠতেই এ দেশের লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী চীৎকার করে পাড়া মাতাতে শুরু করেছিল!

গোঁড়া হিন্দুয়ানির মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'-তে পনেরোই ডিসেম্বরের টাউন হলের মিটিংয়ের একটা বিবরণ বার হয়। এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাসে ঘোর আপত্তি জানিয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন—"ইংরেজরা যাতে এ দেশে বসবাস করতে পারেন ও চাষবাস করতে পারেন এই দাবী জানিয়ে আর্জি পেশ করবার জন্যে টাউন হলে একটি মিটিং হয়েছিল। এই খবর পেয়ে ছোট বড় ধনী গরীব সব জমিদার ও ইজারাদারেরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, কেন-না যদি ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে এ দেশের লোকদের অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হবে। ইংরেজরা যদি এ দেশে জমিদার ও চাষী হিসেবে আসে তাহলে আশঙ্কা হয় যে এ দেশের লোকের জাত যাবে, তাদের প্রাণধারণের উপায় নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমি নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে এ দেশবাসীদের একটানা বিবাদ চলবে। ইংরেজদের এ দেশ দখলের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ দেশবাসী শান্তিতে বাস করছিল। সন্দেহ নেই যে যতদিন ইংরেজরা এ দেশ শাসন করবে ততদিন ন্যায় বিচার অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের জমির ও সম্পত্তির ভাগীদার হতে শুরু করে তাহলে দেশের লোকের দুর্দশার শেষ থাকবে না। এই আর্জি আমাদের যে কতদূর উৎকণ্ঠিত করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।"

'সমাচার চন্দ্রিকা'-তে টাউন হলের মিটিং সম্বন্ধে নানা রকম মন্তব্য বার হবার অল্প দিন পরে পরে দুটি চিঠি বের হলো 'সংবাদ কৌমুদী'-তে। একটি চিঠি বের হল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী আর-একটি বের হল

দশই জানুয়ারী। দুটি চিঠির লেখক হচ্ছেন 'নিরপেক্ষ জমিদার' অর্থাৎ দ্বারকানাথ ঠাকুর। দুটি চিঠিই আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। পয়লা জানুয়ারী চিঠিতে দ্বারকানাথ লিখছেন—

সংবাদ কৌমুদীর সম্পাদকসমীপে

মহাশয়,

নিম্নলিখিত মন্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করলে যে বুদ্ধিমত্তা চারদিকে প্রসারিত হবে তাতে মিথ্যা বর্ণনার মেঘ অপসারিত করবে এবং সবার নিকট সত্য উদ্ঘাটিত করবে।

'চন্দ্রিকা'র ৫৭২ পৃষ্ঠায় সম্পাদক ১৮২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বরের টাউন হল সভার এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন যাতে অনেক ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বর্ণনা আছে। প্রথমত, বলা হয়েছে, "আমরা মনে করি দেশীয়দের মধ্যে কেবল বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।" এই অবস্থাটি ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে কারণ বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, বাবু শিবচন্দ্র সরকার এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁদের নাম না জানা থাকায় আমি তাঁদের সঙ্গে পত্রের যোগাযোগ রাখতে পারি নি। 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক কি তাঁদের দেখেন নাই? পূর্ববর্ণিত বাবুরা জমিদার এবং নীল প্রভৃতির ব্যবসা করেন। সুতরাং এই সভার উদ্দেশ্য তাঁদের ভাবী লাভের পক্ষে অনিষ্টকর হবে এটা যদি তাঁরা বুঝতেন তবে তাঁরা তার বিরোধিতা করতে ইতস্তত করতেন না। দ্বিতীয়ত, 'চন্দ্রিকা' বলছে, "মাননীয় কম্পানীর সৈনিক বা অ-সৈনিক কোনো কর্মচারীই সভায় যোগদান করেন নি এবং আমরা কোনো কাগজ হতে জানতে পারিনি এই বিষয়ে তাঁদের মতামত কী।"

এ বক্তব্যও অতিশয় ভুল কারণ প্রায় ত্রিশ জন মাননীয় কম্পানীর পদস্থ অ-সৈনিক, সৈনিক, চিকিৎসক ও ধর্মীয় কর্মচারী উক্ত সভায় যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সরকারের সেক্রেটারী মি. এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কালেক্টর ও লবণের এজেন্ট মি. টি. জি. দ্বি. প্লাউডেন, বঙ্গ সেনাবিভাগের মি. রিচার্ডসন, ডাক্তার স্ট্রঙ্গ এবং রেভারেণ্ড পাদ্রীর এঁদের আমি দেখেছিলুম। এঁদের নামগুলো আমার বিশেষভাবে জানা। কম্পানীর কোনো কর্মচারী প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে প্রকাশ

করেন নি।—তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যে প্রস্তাবগুলো সভায় উপস্থাপিত হয় সেগুলি সম্বন্ধে তাঁদের অনুমোদন ছিল। যদি কম্পানীর কর্মচারিগণ ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাস মনঃপূত না করতেন তবে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের অভিমত জানাতেন যেমন সরকারী কর্মচারী মি· সি· জি· মিডল্‌টন পরবর্তী কালে উত্তমাশার একটি সভায় করেছিলেন। কম্পানীর কর্মচারীরা কেন যে সভায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁদের অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেন না সেটা হচ্ছে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ভয়ে, কারণ তাঁরা চিনির ব্যবসা এবং ইয়োরোপীয়দের ভারতে অবাধ বসবাস সম্পর্কে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি আবেদনে স্বাক্ষর দিয়েছেন। সুতরাং তাই বর্তমান আবেদনে স্বাক্ষর দিতে এই ভদ্রলোকদের আপত্তি আমার মনে হয় কোর্ট অব ডিরেক্টরদের শেষ আদেশের দরুণ। তৃতীয়ত, 'চন্দ্রিকা' দেশীয় পাঠকদের জিজ্ঞেস করেছেন,—এই আবেদনে "যে দেশীয়রা স্বাক্ষর দিয়েছেন কিম্বা দেবেন তাঁদের কী উপকার হবে?"

'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক জমিদার নন, নীলের লেনদেন বা কোনো ব্যবসা তাঁর নেই। মফঃস্বল সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানও তাঁর নেই। এই তিন বিষয়ের একটিরও জ্ঞান যদি তাঁর (সম্পাদকের) থাকত তাহলে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন না। নীলকরের অধীনস্থ যে-কোনো রায়তের সঙ্গে তিনি কথা বলে দেখতে পারেন—যে রায়ত নীলচাষের আগে একই স্থানে বসবাস করছে এবং সেখানেই কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। এভাবে যে খবর তিনি পাবেন তাতে তাঁর বিস্মৃতি বা ভুল অপসারিত হতে পারবে। এই ব্যাপারের আগে 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদকের অজ্ঞতা কেউই উপলব্ধি করেন নি। যা হক প্রশ্নকারীর ইচ্ছা পূরণ করা দরকার।

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তাঁর কাছে জানতে চাই, জমিদার বুদ্ধিমান হবেন এবং রায়ত পরিশ্রমী হবেন—এটা উচিত কি-না?

এ কথা সুবিদিত যে যেখানে চাষীরা সংখ্যায় বেশি এবং কর্মকুশল, জমি সেখানে ভাল চাষ হবে এবং জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে কোনো জমিই শেষ পর্য্যন্ত অনাবাদী থাকবে না। এই হেতু এ কথা নিশ্চয়ভাবে বলা যেতে পারে যে দেশের উন্নতির জন্যে শিল্প, নিপুণতা ও প্রচুর জনসংখ্যার প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের

গায়ের রং শাদা বা কাল তা অবান্তর। এই সুদৃঢ় ধারণা থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এ দেশে ইয়োরোপীয়দের শিল্প ও কর্ম-নিপুণতা প্রবর্তিত হলে এবং তাঁদের অবাধে এ দেশে বসবাস করতে দিলে এবং জমির চাষ তদ্বির করতে দিলে সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার হবে।

ইয়োরোপীয়গণের এ দেশে অবাধ বসবাস এবং ইয়োরোপীয়দের দ্বারা জমি চাষ—এই দুয়ের ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, ক্রেতার অনুপাতে দাম চড়বে। যেমন নিলামে বহু লোক একত্রিত হয় বলে দ্রব্যাদি ভাল বিক্রি হয়। এটা সবাই জানেন যেখানে বহু লোকের সমাবেশ সেখানে ঘরভাড়া বৃদ্ধি পায়। এতে জমিদার, ইজারাদার, কুৎকিনাদার প্রভৃতি প্রচুরভাবে উপকৃত হন।

উপরন্তু, ক্ষেতে বর্ধিত চাষের ফলে ক্ষেত-মজুরেরা ভাল মজুরি পাবে, এবং একথা ইতিমধ্যেই সুবিদিত যে যশোর জেলায় ও তার আশেপাশে নীল কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে এবং তাদের উৎপাদন কুশলতার দরুন মজুরের বেতন একটাকা এবং একটাকা আট আনা থেকে মাসিক তিন টাকা আট আনা এবং চার টাকায় উঠেছে। বেহারা ও চাকররা পূর্বে কাহনে-গোনা কড়িতে বেতন পেত—এখন কত টাকা তারা পায়? আমি নিশ্চিতভাবে জানি হুগলী জেলার সেসব অংশে, যেখানে নীল বা অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন হয় না সেখানে এখনও মজুরের মজুরি মাসিক দু টাকা চার আনা থেকে দু টাকা আট আনার বেশি নয়। একথা সত্য এবং সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে যে-জেলাতেই ইয়োরোপীয়গণের ভীড় হয় সে অঞ্চলের দেশীয়রা আরামপ্রদ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভদ্রতা-সম্মত জীবিকার্জনে সমর্থ হয়।

এ দেশে জমির দশশালা বন্দোবস্ত জমিদারির দাম অত্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। অনেক বড় বড় তালুক দুই-তিন বৎসরের ফসলের দামে খরিদ হয়েছে। কিন্তু এখন অনেকগুলি তালুক কুড়ি, পঁচিশ এবং ত্রিশ বৎসরের উৎপাদনের মূল্যে বিক্রী হয়েছে। ভূসম্পত্তির এমন অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? কারণ—ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাস, তাঁদের উন্নত ধরনে নীল তৈরি এবং সর্বশেষে তাঁদের ছদ্ম নামে জমি খরিদ।

আমি সব নিরপেক্ষ লোককে বিচার করতে বলি। নীল-উৎপাদনে

এ দেশে বার্ষিক দুই কোটি টাকা ব্যয় হয়, তার বেশির ভাগ দেশীয়দের হাতে আসে, ইয়োরোপীয়দের মফঃস্বলে আসার ও বসবাস করবার আগে, তারা এ সম্পদের খনির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আমি সব নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের এই প্রমাণিত সত্য বিচার করতে বলি। ইয়োরোপীয়দের এ দেশে অবাধ বসবাস যে দেশের ভবিষ্যৎ উপকার সাধন করবে এ তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না।

'চন্দ্রিকা'র নিকট একথা স্পষ্ট নয় যে কলকাতার জমি ও বাড়ির ভাড়া ও দাম মফঃস্বল থেকে কত বেশি। এবং কলকাতার দেশীয় অধিবাসীরা তাদের মফঃস্বলের ভাইদের বুদ্ধিতে, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতায় কতটা ছাড়িয়ে গেছে এবং তাদের আগেকার নীচ স্বভাব ও অন্যান্য দোষ কতটা ত্যাগ করেছে। এইসব উন্নতি কোত্থেকে এসেছে আমাদের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ছাড়া? অবিশ্যি এমন কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী লোক আছে যারা ইয়োরোপীয়দের (যারা মফঃস্বলে বাস করার দরুন এ দেশবাসীদের সঙ্গে প্রায়ই মেলামেশা করার ফলে স্বভাবতই চারপাশের লোকদের উন্নতি কামনা করবে) প্রাণসঞ্চারিণী নিপুণতা ও শ্রমক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধতা করবে। আমি আবার বলছি যে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা এই মঙ্গলপ্রসূ কাজে উৎসুক নয়।

৫৮৬ পৃষ্ঠায় 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক বলেছেন, "ইয়োরোপীয়দের মফঃস্বলে বসবাস দ্বারা এবং জমি চাষ দ্বারা আমাদের (জাতব্যবস্থা) বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।" তার উত্তরে আমি বলি, এই সম্ভাবনা কী ভাবে চিন্তা করা যায় যখন কলকাতায় বহু বৎসর যাবৎ ইয়োরোপীয়রা বসবাস করছেন এবং কোনো হিন্দুই তার জন্যে বর্ণচ্যুত হচ্ছে না? মফঃস্বলবাসীরা তবে কেন ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করে বর্ণচ্যুত হবে? 'চন্দ্রিকা' আবার বলছেন, "ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও ইয়োরোপীয়দের দ্বারা জমি চাষ আমাদের নিত্যকার আহার্যের অধোগতি ঘটাবে।" এও অত্যন্ত ভুল ধারণা কেন-না নিপুণতা ও নিয়মিত পরিচালনা দ্বারা শস্যোৎপাদন সম্ভবত অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে, এ বিষয়ে ইংরেজদের দক্ষতা সকলেই জানে।

'চন্দ্রিকা' এও বলেছেন যে "জমি প্রভৃতি নিয়ে ইয়োরোপীয় ও মফঃস্বলের দেশীয়দের মধ্যে অবিরাম ঝগড়া চলবে।" এর উত্তরে আমি বলি চন্দ্রিকার সম্পাদক দেশীয়দের নিজেদের মধ্যে বিবাদের উপশম কখন দেখেছেন যে তিনি ভেবে বসলেন যে তাদের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাসের ফলে বিবাদ শুরু হবে? ব্যবসা এবং বিবাদ হাত ধরাধরি করে চলে অর্থাৎ সময় সময় ঝগড়া ব্যতিরেকে কোনো ব্যবসাই চালান যায় না। কার সঙ্গে ঝগড়া? যেসব ইয়োরোপীয়রা এ সহরে দেশীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে আছেন তাঁদের আচরণ থেকে আমি অনুমান করে নিচ্ছি যে তারা আমার মফঃস্বলের দেশবাসীরা যারা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ঘনিয়ে তোলে তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবে না। সরকারের আইন-কানুন ইয়োরোপীয়রা ভালভাবেই জানেন। তাই তাঁদের কারো সঙ্গে বিবাদ করবার কি কারণ থাকতে পারে?

এ দেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাস বিশেষ সুবিধাজনক হবে এবং কোনো শ্রেণীর লোকের পক্ষেই তা অনিষ্টকর হবে না, সে লোক উপরতলারই হক বা নীচের তলার হক, ধনীই হক বা দরিদ্র হক, জমিদার হক বা চাষী হক। বিশেষ করে মুৎসুদ্দি, হেড সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি যারা এঁদের সমর্থন পাবে তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। কলকাতার দিকে তাকালেই এ অবস্থা দেখা যেতে পাবে।

সম্ভবত 'চন্দ্রিকা' অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী নন, ফলে জনসাধারণের উপকার হয় এমন কিছুর আবির্ভাবকে তিনি রোধ করতে চান: একটু ভেবে দেখলেই তাঁর ভ্রান্ত ধারণার যে কোনো গুরুত্ব নেই সেটা ধরা পড়ে। আশা করি যা বলা হয়েছে তাই যথেষ্ট হবে।

জনৈক নিরপেক্ষ জমিদার

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের দশই জানুয়ারী 'সংবাদ কৌমুদী'তে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই দ্বিতীয় চিঠিটি বের হল—

সংবাদ কৌমুদীর সম্পাদকসমীপে

মহাশয়,

১২ই পৌষের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে উপনিবেশের বিরুদ্ধে কতগুলো ভিত্তিহীন আপত্তি আনা হয়েছে।

তার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। একজন জমিদার বলেন, যেসব স্ত্রীলোক সুতো কেটে বিক্রি করেন তাঁরা ইয়োরোপে প্রস্তুত সুতোর আমদানীতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত। ময়দার ফেরিওয়ালাদের ব্যবসাও এই নগরে ইয়োরোপীয়-ময়দা পেষার যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে বন্ধ হয়েছে। তাই তিনি আশঙ্কা করছেন যে ইংরেজদের এ দেশে বসবাসের ফলে এ ধরনের কুফল ফলবে। উত্তরে আমি বলি, যে স্ত্রীলোকেরা সুতো বিক্রি করত তারা এখনো সুতো বিক্রি করছে এবং ময়দার ফিরিওয়ালারা তারাও এখনও নিজ নিজ ব্যবসা করছে—এই বাস্তবতার সাক্ষ্য থেকে সুতো এবং ময়দার ব্যবসার ধ্বংস হয়েছে একথা আমরা মেনে নিতে পারি নে। একমাত্র পরিবর্তন এই যে ঐসব দ্রব্যের প্রাচুর্য ঐ দ্রব্যগুলির দাম কমিয়ে দিয়েছে। এটা অনিষ্টকর হওয়া দূরে থাক এটিকে সুফল বলে মনে করা উচিত। ভাল কাপড়ের কম দরের দরুন যে কাপড দরিদ্রশ্রেণী আগে আকাঙ্ক্ষা করত কিন্তু কিনতে পারত না, সে কাপড় তারা কিনতে পারে। ময়দাসম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়। কতিপয় লোকের সামান্য অনিষ্টের আশঙ্কায় দুঃখিত হওয়া—যখন সমগ্র সম্প্রদায় প্রচুরভাবে উপকৃত হচ্ছে—কার্যত সমাজের অমঙ্গল ইচ্ছা করা। ব্যবসায়ীদের প্রাণের ইচ্ছা এই যে যে-দ্রব্যের ব্যবসা তারা করে তা সংখ্যায় কম উৎপন্ন হক, আর তার ফলে তার দাম চড়ুক। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর ইচ্ছা প্রশংসনীয় বিবেচিত হতে পারে না। উদাহরণত, এ দেশে ইংলণ্ডে প্রস্তুত ছাপার কাজের বিভিন্ন যন্ত্রের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে কিছুসংখ্যক বই ও দলিল নকল করে যারা জীবিকা উপার্জন করত তাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়েছে কিন্তু কোন্ বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এই বিবেচনায় প্রভূত উপকারের দিকে চোখ বুঁজে থাকবেন—যে উপকার হয়েছে অনেককে জীবিকা দিয়ে, পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং জ্ঞান বিতরণ করে!…'চন্দ্রিকার' সম্পাদক রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, স্বর্ণকার, দরজী এবং মাঝির এই পাঁচ জনের উদাহরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন, উক্ত জীবিকায় নিযুক্ত হয়ে মানুষ যে লাভ পায় তা ইয়োরোপীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক কমে গেছে এবং অনেক দেশীয় যারা আগে ঐসব জীবিকায় গ্রাসাচ্ছাদন করত তারা অনেক সম্পত্তি

গড়ে তুলেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁর প্রিয় অভিমতগুলির সমর্থনার্থ উক্ত উদাহরণ দিয়ে সত্য অবস্থা বিবেচনা করেন নি—শুধু উপরে উপরে ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়েছেন। সত্য কথা এই যে যখন অনেক ইয়োরোপীয় কলকাতায় এসে বিভিন্ন ব্যবসাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল, লোকেরা তখন তাদের ব্যবসা শিখতে শুরু করল এবং যথেষ্ট কর্মনিপুণতা অর্জনের পর বেশি বেতনে ইয়োরোপীয় দ্বারা কর্মে নিযুক্ত হতে লাগল। তার আগে একজন বা দু জন ব্যক্তি যারা তাদের কাজে যথেষ্ট নিপুণতা অর্জন করেছিল তারা উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে ব্যবসা একচেটিয়া করে নিয়েছিল এবং তাদ্দ্বারা প্রচুর লাভ করেছিল। কলকাতার প্রত্যেক মহল্লায় যে রাজমিস্ত্রীরা থাকে শুধু তাদের কথাই বিবেচনা করা যাক; কত ছুতোরের, স্বর্ণকারের এবং দরজীর দোকান স্থাপিত হয়েছে এবং নৌকোর সংখ্যা কত বেড়েছে। এইসব লোক ব্যবসার অভাব ভোগ করছে না। যখন আমরা তাদের কাউকে কাজে নিযুক্ত করতে চাই তখন তারা যা চায় তার চেয়ে অনেক কম মজুরিতে আমরা কিছুতেই রাজী করতে পারি নে। এ শহরের কর্মীর সংখ্যা সহজে গোনা যায় না এবং সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দরজীর বর্তমান বেতনের নিম্নতম হার হচ্ছে সাত থেকে আট টাকা, এবং উচ্চতম হার হচ্ছে মাসিক ষোল টাকার কম নয়। পনের বছর আগে তাদের মজুরির হার ছিল চার টাকা—এবং উচ্চতম হার আট টাকার বেশি ছিল না। আগে ছুতোররা বড় বড় হামানদিস্তে ও মুষল তৈরি করেও বড় জোর তিন-চার টাকা কামাই করত। এখন ইয়োরোপীয়দের বড় বড় ব্যবসায়ের ফলে কোনো কোনো ছুতোর চল্লিশ কেউ কেউ পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। স্বর্ণকার, রাজমিস্ত্রি, মাঝিদের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

সম্পাদক আরো বলেছেন যে "দরজী হিসেবে গিব্‌সন্‌ এণ্ড কোংর, ছুতোর হিসেবে রোল্ট্‌ এণ্ড কোং-র এবং জহুরী হিসেবে হ্যামিল্টন এণ্ড কোং-র প্রতিষ্ঠান যে দেশীয়রা এইসব পেশায় নিযুক্ত ছিল তাদের দরিদ্র করে তুলেছে।" আমি সম্পাদক মহাশয়কে ওসব ভদ্রলোকের দোকানগুলি ঘুরে আসতে বলি এবং কত শত দেশীয় ভাল বেতনে

সেখানে নিযুক্ত আছে সেটা দেখতে বলি। বড় বড় রাজার আমলেও স্বদেশী সম্প্রদায়ের এমন বৃহৎ অংশ এত ভালভাবে পোষিত হয় নি—ভালভাবে পোষিত হয়েছে এমন উদাহরণের কথাও আমরা কখনো শুনি নি। সত্য এই যে আগে সমস্ত ব্যবসা একজন বা দু জনের কবলে ছিল এবং তারা সব চাইতে বেশি লাভ করত। এখন ব্যবসা সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই আগেকার মত লাভ করবে এটা স্বভাবতই আশা করা যেতে পারে না। তারা সবাই কিন্তু ইয়োরোপীয়দের বিস্তৃত ব্যবসার দরুন কাজ পেয়ে থাকে এবং মোটের উপর এখন তারা বেশি রোজগার করে। আগেকার তুলনায় তাদের এখনকার রোজগার বেশি।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই বিষয়ে একটি মত নির্ধারণ করে এবং উপযুক্ত অনুসন্ধান করে কেউই ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাস করলে যে উপকার হবে তা নিয়ে বিকৃত মনের পরিচায়ক যে বিবাদ সেই বিবাদ করবেন না।

জানুআরি ১০। জনৈক নিরপেক্ষ জমিদার

এই চিঠিদুটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থনীতির জ্ঞান এবং ইতিহাসের ধারায় কোন্‌টি কখন সাধন করা কর্তব্য ও কোন্ শক্তি দিয়ে সেটি সম্পন্ন করতে হবে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া কলমের মুন্সিয়ানার পরিচয় তো ছত্রে ছত্রে আছে চিঠিদুটিতে। ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে হবে, পুরনো উৎপাদন-প্রণালীকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় কল-কারখানা বসিয়ে নানা ধরনের জিনিস ও সস্তা জিনিস উৎপন্ন করতে হবে। এইটেই হল সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্ম। তাই সেটা ধলা আদমী দিয়ে হক কিম্বা কালা আদমী দিয়ে হক, তাতে কিছু যায় আসে না। যে-কোনো শক্তিকে ব্যবহার করে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অতি সচেতনভাবে এই শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বারকানাথ ও রামমোহন। নানা অজুহাতে এই শিল্প-বিপ্লবকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল বাংলার জমিদাররা। কখনো চাষীদের সর্বনাশ হবে এই ধুয়ো তুলে, কখনো জাত নষ্ট হবে এই আশঙ্কার ঢেউ তুলে, কখনো-বা তাঁতী

কুমোর, স্যাঁকরাদের বন্ধু সেজে তাদের সর্বনাশ হবে এই অজুহাতের দোহাই দিয়ে। গোঁড়া হিন্দুয়ানির ও জমিদারদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে মিথ্যে ও কুসংস্কারের ঠেকা দিয়ে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছিল। সেইসব অভিসন্ধিমূলক মিথ্যে ও কুসংস্কারের কুয়াশাকে যুক্তির সূর্যালোকে দূর করলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম চিঠিতেই তিনি দেশের লোককে জানিয়ে দিলেন যে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রচারিত খবর যে টাউন হলের সভায় ভারতীয়দের মধ্যে থেকে শুধু দ্বারকানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। আরো অনেক সম্ভ্রান্ত ভারতীয়েরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীরও অনেক বড় বড় আমলারা হাজির ছিলেন সেই মিটিংয়ে। খোদ প্রিন্সেস্ সাহেব, গভর্মেণ্টের সেক্রেটারী ও পাউডেন্ সাহেব, কলেক্টর ও নিমক-এজেণ্ট সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের দুটি ছাড়াও আরো অনেক সাহেব ছিলেন সেই সভায়। এই সভাটিকে একটি বিশেষ দলের দলীয় সভা বলে লোক ঠকাবার যে প্রয়াস 'সমাচার চন্দ্রিকা' করছিল, সেই অপচেষ্টাকে তথ্যের ধাক্কায় ধূলিসাৎ করে দিলেন দ্বারকানাথ। তারপরে শুরু করলেন তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা'র যুক্তিগুলির উত্তর দিতে। 'সমাচার-চন্দ্রিকা'-র সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন—এই দরখাস্তর ফলে দস্তখতকারীদের কি সুবিধে হবে? দ্বারকানাথ তার উত্তরে বলছেন—'চন্দ্রিকা-সম্পাদক নীলকুঠিতে কাজ করে ও সেই জায়গারই বাসিন্দে এমন যে-কোনো রায়তের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। তাহল নীলকুঠি পত্তন হবার আগে ও সেই নীলকুঠিতে কাজ করবার আগে সেই রায়তের কি অবস্থা ছিল ও নীলকুঠিতে কাজ করবার পর তার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন ও তার ফলে চন্দ্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রান্তি দূর হবে।' এই উক্তিটুকু করেই দ্বারকানাথ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেবার কাজে লেগেছেন। তিনি বলেছেন—'ইয়োরোপীয়দের বসবাসের ফলে ও তাদের চাষবাসের দরুন জমির দাম বেড়ে যাবে। সকলেই জানে যে যেখানে অধিবাসীদের সংখ্যা বেড়ে যায়, সেখানে বাস্তুভিটের জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে জমিদার, ইজারাদার ও কুৎকিনাদারেরা লাভবান হয়। তাছাড়া বেশি জমি চাষে আসার ফলে চাষীরা বেশী মজুরি পাবে।

সকলেই জানেন যে যশোর জেলায় ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলিতে নীলকুঠিগুলি স্থাপিত হওয়াতে যেসব মজুরেরা এই কুঠিগুলিতে কাজ করে, কর্মনৈপুণ্যের দরুন তাদের মজুরি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগে মাসিক মজুরি ছিল এক টাকা থেকে দেড় টাকা এখন মজুরি হয়েছে মাসে সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা। একটু চেষ্টা করলেই জানা যাবে যে যেসব জেলায় ইয়োরোপীয়রা গিয়ে বাস করছে সেখানেই জেলার অধিবাসীরা বেশ ভালভাবে, এবং কোনো কোনো জায়গায় খুব ভালভাবে জীবিকা অর্জন করতে পেরেছে।' 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল জমিদারদের কাগজ। তাই জমিদারদের জন্যে হাহুতাশে-ভরা ছিল 'চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠাগুলি। অবিশ্যি চাষীদের দুঃখে 'চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠাগুলি যে মাঝে মাঝে সপ্‌সপে হয়ে উঠ্‌ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটি মেকী কান্নার মতলবী চোখের জলে। 'চন্দ্রিকা'-র এই হাহুতাশ ও চোখের জল—এই দুমুখো দরদের জবাব দিলেন দ্বারকানাথ। তিনি অকাট্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের ফলে ও সেইসব অঞ্চলে তারা চাষবাস শুরু করায় বহু লোক এসে জুটেছে নীলকুঠির কাজে, ফলে জমির দাম বেড়ে গেছে সেইসব অঞ্চলে। জমিদারেরা ও ইজারাদারেরা এই কারণে ভিটের জমির খাজনা আগের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে এইসব অঞ্চলে। ইয়োরোপীয়রা গ্রামাঞ্চলে বাস করায় ও কৃষিকার্যে হাত দেওয়ায় জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ই নি, বরঞ্চ লাভবান হয়েছে। আর চাষীরা, তারাও ক্ষেত-মজুরি করে আগে যে মজুরি পেত তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশি পাচ্ছে নীলকুঠিতে কাজ করে। তারাও তাই লাভবান হয়েছে ইয়োরোপীয়রা গ্রামাঞ্চলে বাস করায়। শুধু তাই নয়, দশশালা বন্দোবস্তের পর তালুকগুলির দাম একেবারে পড়ে গিয়েছিল। দু-তিন বছরের ফসলের মূল্যে তালুকগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। সেই তালুকগুলি এখন কুড়ি পঁচিশ বছরের ফসলের দামে, কোথাও বা ত্রিশ বছরের ফসলের দামে বিক্রি হচ্ছে। দ্বারকানাথ প্রশ্ন করেছেন—কেন এই তালুকগুলি এখন এত বেশী দামে বিকোচ্ছে? আর নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন—'ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বাসের ফলে, এ দেশের চাষীদের ও পাকা-মাল-উৎপাদনকারীদের ইয়োরোপীয়রা শিক্ষা দেওয়ার ফলে, উন্নত প্রণালীতে নীলের ও অন্য অন্য জিনিসের চাষ করার দরুন

এবং ইয়োরোপীয়রা বেনামীতে জমি কেনে তার দরুন জমির দাম এত বৃদ্ধি পেয়েছে।'

তারপর দ্বারকানাথ আরো একটি মূল্যবান তথ্য আমাদের সামনে হাজির করছেন। তাঁর চিঠি থেকে আমরা জানছি যে নীলকুঠির ইয়োরোপীয় মালিকেরা বছরে দু কোটি টাকা নীল চাষের জন্যে ব্যয় করছে আর এই টাকার বেশির ভাগটা পাচ্ছে এ দেশের লোক। এর ফলে নীলকুঠির আশেপাশের চাষীরা ও মধ্যবিত্তরা যে সুযোগ পেয়েছে তাদের অবস্থা ফিরোবার, কস্মিনকালে সে সুযোগ তারা পায় নি। কলকাতার দিকে আঙুল দেখিয়ে দ্বারকানাথ বলছেন—'চন্দ্রিকা'-র কাছে কি এটাও স্পষ্ট নয় যে কলকাতায় জমির ও বাড়ীর দাম কি রকম বেড়েছে? তাছাড়া কলকাতার বাসিন্দেরা জেলার লোকদের চেয়ে বুদ্ধিতে, ব্যবসার অভিজ্ঞতাতে কিরকম এগিয়ে গেছে ও তাদের আগেকার নীচ অভ্যাস ত্যাগ করে তারা গাঁয়ের লোকের চেয়ে কত অগ্রসর হয়েছে? কিছু বদমতলবী ও হিংসুটে লোক আছে, তারা ছাড়া আর সকলেই ইয়োরোপীয়দের কর্মতৎপরতা ও পরিশ্রমের ফলে কি উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটা জানে, ও যাতে আরো উন্নতি হয় তা আন্তরিক ভাবে চায়।

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক জাতের কথা তুলে লোকদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা গ্রামাঞ্চলে বাস করলে ও চাষবাস শুরু করলে গ্রামবাসীদের জাত যাবে এই ধুয়ো তুলে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক গোঁড়ামিকে খুঁচিয়ে তোলবার খেলা শুরু করেন। এই চতুর নোংরামির যুক্তিহীনতা দেখিয়ে দেন দ্বারকানাথ। তিনি বললেন—'ইয়োরোপীয়রা তো অনেক বৎসর থেকে কলকাতায় বাস করছে, কোনো হিন্দুর কি সেই কারণে জাত গেছে? তাহলে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মেশার জন্যে মফঃস্বলের হিন্দুদেরই বা জাত যাবে কেন?' 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ইয়োরোপীয়রা চাষবাস শুরু করলে আমাদের কৃষিজাত ফসলের ঘাটতি হবে। এই নির্বুদ্ধি মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে দ্বারকানাথ বললেন—'এটা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেন-না নিপুণ ও একটানা তত্ত্বাবধানের ফলে কৃষিজাত ফসল অনেক বেড়ে যাবে; আর এ বিষয়ে ইংরেজদের কর্মতৎপরতা সর্বজনবিদিত।'

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের মোক্ষম যুক্তি যে ইয়োরোপীয়রা মফঃস্বলে বসবাস করলে 'জমি নিয়ে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে এদেশের লোকদের ঝগড়া লেগেই থাকবে,' তার উত্তরে খুব শান্ত শ্লেষের সঙ্গে দ্বারকানাথ বললেন—'এ দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কবেই বা এত কম ছিল যে ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বাস করলে ঝগড়া শুরু হবে এই আশঙ্কা "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক করবেন?' এইভাবে দ্বারকানাথ তাঁর প্রথম চিঠিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র সব যুক্তির উত্তর দিলেন। তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে দ্বারকানাথ আরো অনেক তথ্য ও যুক্তি পেশ করলেন দেশের লোকের সামনে।

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের ১২ই পৌষের চিঠিতে যেসব যুক্তি ও অভিযোগ ছিল সেগুলির উত্তর দ্বারকানাথ তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখের চিঠি) দিলেন। 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন যে ইয়োরোপ থেকে সুতোর আমদানী হওয়াতে এ দেশে যে স্ত্রীলোকেরা সুতো বিক্রি করত তাদের দুর্দশার শেষ নেই, আর ইয়োরোপীয়রা কলকাতা সহরে ময়দার কল বসানোর ফলে যারা ময়দা বিক্রি করত তাদেরও চরম দুর্দশা হয়েছে। এর উত্তরে দ্বারকানাথ বললেন যে যত দুর্দশার কথা 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক বলেছেন, দেশের লোকের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার কথা বলেছেন, সেরকম কিছু ঘটে নি। এখনো মেয়েরা সুতো বিক্রি করছে, আর ময়দা ফিরি করছে ফিরিওয়ালারা।

'একমাত্র যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটি হচ্ছে এই যে এইসব জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হওয়ায় এদের দাম কমে গেছে। এটা ক্ষতিকর তো নই-ই বরঞ্চ এটার ফল শুভকর বলে গণ্য করতে হবে। আগে গরীবেরা ভাল কাপড় কামনা করত কিন্তু কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন ভাল কাপড়ের দাম কমে যাওয়াতে গরীবেরা তা কিনতে পারছে। আটা সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। **যখন বহুলোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশঙ্কা করে দুঃখ প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে সমাজের অমঙ্গল কামনা করা।**'

(বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

এই কথাগুলি দ্বারকানাথের আসল চরিত্র আমাদের সামনে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। নিজে জমিদার ও ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও দ্বারকানাথ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জমিদার ও ব্যবসায়ীর স্বার্থের চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করতেন। জিনিসের দাম চড়া থাকলে ব্যবসায়ীদের লাভ আর জিনিসের দাম কমলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ—দ্বারকানাথ সাধারণ মানুষের কল্যাণকে কতিপয়ের লাভের চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয়ও এই চিঠিতে আমরা পাই। কিছু লোককে ব্যথা না দিয়ে যে কোনো গোড়া-ঘেঁসা পরিবর্তন সম্ভব নয়, এই বোধ দ্বারকানাথের ছিল। কিছু লোকের এই অবশ্যম্ভাবী দুঃখকে বহু-লোকের সুখসৃষ্টির জন্যে অবিচলিতচিত্তে স্বীকার করে নিতে হবে—ইতিহাসের গতির এই নিয়ম দ্বারকানাথ জানতেন ও সেটি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্তও করেছেন—'যখন বহুলোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশঙ্কা করে দুঃখ প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে সমাজের অমঙ্গল কামনা করা।'

শিল্পবিপ্লবের সূচনায় কলকারখানা প্রবর্তনের সময় কুটীরশিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য। কলে জিনিস তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পে যে সংখ্যায় জিনিস তৈরি হত তার তুলনায় অনেক বেশী জিনিস উৎপন্ন হবে, ও অনেক বেশী জিনিস তৈরি হওয়ার ফলে জিনিসের দামও কমে যাবে আগের তুলনায়। ফলে কুটীরশিল্প সংকুচিত হতে বাধ্য ও যারা কুটীরশিল্পের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে তারা অনেকে বেকার হবে এটাও অনিবার্য। এই শিল্প-বিপ্লবে সমাজের কিন্তু কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ নেই। কিছু লোকের দুঃখের মূল্যে অগুন্তি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে মানবসমাজ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জিনিসের মূল্য কমে যাওয়ায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিছক প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে প্রকৃতি মানুষকে যে পশুজগতের বাসিন্দা করে রেখেছিল এতদিন, তার থেকে মুক্তি পাবার পথ মানুষ সূচনা করে। ভারতবর্ষের শিল্প-বিপ্লবকে দ্বারকানাথ অতি সচেতনতার সঙ্গে আবাহন জানিয়েছেন ও কিছু লোকের দুঃখে বিগলিত হয়ে বহু-লোকের সুখদায়ক ও মানবসমাজের অগ্রগতির সহায়ক এই শিল্প-বিপ্লবকে বাধা দিতে চেষ্টা তো করেনই নি, বরঞ্চ সর্বতোভাবে তার সমর্থন

করেছেন দ্বারকানাথ। এইখানেই দ্বারকানাথের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

ব্যবসায়ীদের তীব্র কশাঘাত করে দ্বারকানাথ বলছেন :—'ব্যবসায়ীদের প্রাণের ইচ্ছে এই যে যেসব জিনিস নিয়ে তারা কারবার করে সেসব জিনিস যেন কম পরিমাণে তৈরি হয়, যাতে করে তাদের দাম বেড়ে যায় ; কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের এই অভিপ্রায় নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। যেমন এ দেশে যে নানা ধরনের বিলিতী মুদ্রাযন্ত্র আমদানী করা হয়েছে ছাপার কাজের জন্যে, তাদের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মুদ্রাযন্ত্র আমদানীর জন্যে যারা বই নকল করে সেইসব নকলনবীশদের কিছু অসুবিধে নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু তাই বলে কোনো বুদ্ধিমান লোকই বিলিতী মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের দ্বারা যে মহৎ উপকার সাধন করা হয়েছে—অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান করেছে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও শিক্ষা বিস্তার করে—সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।' কলকারখানার পত্তন যে নিছক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করে না, সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনাও যে সৃষ্টি করে শিল্প-বিপ্লব, এ ধারণা দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথের ছিল।

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক আবার দরিদ্রগতপ্রাণ জনদরদী সেজে হাহুতাশ শুরু করলেন। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, স্যাঁকরা, দর্জি ও মাঝিদের কথা তুলে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক লিখলেন—'এই পাঁচ ধরনের কাজ-করনেওয়ালা লোকদের লাভ অনেক কমে গেছে এইসব কাজে ইয়োরোপীয়দের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ফলে।' দ্বারকানাথ তার উত্তরে বললেন যে, 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক মহাশয় আসল ব্যাপারটা বোঝেন নি, তিনি শুধু ঘটনার উপর উপর আঁচড়েছেন। 'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে যখন ইয়োরোপীয়রা বহু সংখ্যায় কলকাতায় এসে নানা ব্যবসা শুরু করে দিল, তখন এ দেশের লোকেরা সেইসব ব্যবসা শিখতে শুরু করল এবং সেইসব কাজে নৈপুণ্য লাভ করবার পর বেশ মোটা মাইনেতে ইয়োরোপীয়রা তাদের নিযুক্ত করল। ইতিপূর্বে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় দু-একজন লোক যারা কাজ ভাল করে শিখেছিল তারাই ব্যবসাটির একচেটিয়া অধিকারী হয়ে প্রভূত লাভ করেছিল।' আগে দু-চারটি লোক ব্যবসার একচেটিয়া মালিক হয়ে অপরিমিত লাভ করত, এখন কতিপয়ের সেই অসম্ভব লাভ লোটা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু বহুলোক ব্যবসা শিখে আগে যে অসম্ভব কম

মজুরিতে তারা কাজ করত এখন তার চেয়ে অনেক বেশী মজুরিতে তারা কাজ করছে—তাঁর এই মতের যথার্থতা প্রমাণ করবার জন্যে দ্বারকানাথ তখন অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্য হাজির করলেন। কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় যত রাজমজুর বাস করে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। কত ছুতোরের, স্যাঁকরার ও দর্জির দোকান খোলা হয়েছে কলকাতায়। মাঝিদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। এদের যে শুধু সংখ্যাই বেড়েছে, আর এরা কাজ পাচ্ছে না, বেকার হয়ে রয়েছে তা নয়। এরা যদি বেশীর ভাগ বেকার থাকত তাহলে তো এদের মজুরির হার কখনো বাড়ত না। দ্বারকানাথ বলছেন :—"এই সহরের মজুরদের সংখ্যা সহজে অনুমেয় নয়, কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দর্জিদের মজুরির নিম্নতম হার হচ্ছে মাসে সাত টাকা থেকে আট টাকা আর ঊর্ধ্বতম মাসিক মাইনে ষোল টাকার কম নয়। পনের বছর আগে তাদের মাসিক বেতনের হার ছিল নিম্নতম চার টাকা আর ঊর্ধ্বতম আট টাকার বেশী নয়। আগে ছুতোরেরা মাসে তিন চার টাকা রোজগার করত, এখন ইয়োরোপীয়েরা এই ব্যবসা সুরু করাতে কিছু কিছু ছুতোর এখন মাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করছে। স্যাঁকরা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির বেলাতেও সেই একই কথা।"

এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পর দ্বারকানাথ আবার যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—"ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যে আগে সমস্ত ব্যবসাটা দু-চারটি লোকের কবলস্থ ছিল। তারাই প্রচুর মুনাফা লুটত। এখন ব্যবসাগুলি সাধারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আওতায় আসায়, ব্যবসাক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে। অবিশ্যি এরা প্রত্যেকে আগের মত লাভ করতে পারবে না নিশ্চয়, কিন্তু ইয়োরোপীয়দের ব্যবসার ফলে তারা সকলেই কাজ পেয়ে থাকে এবং আগের চেয়ে বেশী রোজগারও করে।'

ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দূর হলে বহু লোক ব্যবসা করে লাভবান হবে, জিনিসের দাম কমে গেলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে, মজুরদের মজুরিও বাড়বে কলকারখানা বাড়লে, সঙ্গে সঙ্গে কু-সংস্কার দূর হবে এবং শিক্ষার বিস্তার হবে—এই মত দ্বারকানাথ বারবার ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তৃতায় ও লেখায়। নতুন নতুন বাজার দখল, জিনিসের দাম কমিয়ে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ—এসব প্রয়োজন ক্যাপিটালিস্ট যান্ত্রিক

উৎপাদন-প্রণালীর সম্প্রসারণের জন্যে। ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লবের সহায়করূপে সে দিন দেখা দিয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়।

মফঃস্বলে যেসব এলাকায় নীলকুঠিগুলির পত্তন হয়েছিল সেইসব এলাকায় চাষীদের আর ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা যে আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে, তার প্রমাণ নিয়ে 'বঙ্গদূত' এগিয়ে এল মফঃস্বল এলাকায় ইয়োরোপীয়দের দ্বারা কৃষিকার্য আরো বিস্তার করা হক এই দাবীর সমর্থনে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর-পরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'রিফর্মার'-ও পেছিয়ে থাকে নি। মার্টিন তাঁর *History of the British Colonies* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলা প্রেস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

> লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইংরেজি তালিকায় প্রদত্ত দুটি সংবাদপত্র ('দি রিফর্মার' ও 'এঙ্কোয়ারার') দেশীয়দের সম্পত্তি এবং তাঁদের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত।...শোনা যায় যে 'দি রিফর্মার' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত বিখ্যাত ধনী ও মহা প্রতিভাশালী হিন্দুর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের 'রিফর্মার' পত্রিকা মফঃস্বল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হওয়া সম্বন্ধে এই মন্তব্য করল—

> অন্যান্য কল্পিত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে আরো অবাধ প্রবেশাধিকার। এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস স্থাপন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে—নিশ্চয়ই এ বিষয় নিয়ে প্রচুর বিবেচনার দরকার আছে। আমরা বলতে পারি নে এ বিষয়ে আমাদের কতিপয় দেশবাসীর যে ভয় আছে তার আমরা অংশীদার। 'নিজেকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সুখী করে তোলবার জন্যে ইয়োরোপীয় কর্মনিপুণতা ও কর্মোদ্যমের প্রয়োগ ছাড়া ভারত আর-কিছু চায় না।' ভারতের সম্পদ ও শক্তি অপরিমেয় এবং যদি ইয়োরোপীয় কুশলতা ও উন্নত ধরনের কাজ দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে যেমন এফ্রিকার জংগল এলাকাগুলির সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের কোনো সাদৃশ্য নেই তেমনি এ দেশের চেহারার এবং দেশবাসীর অবস্থার পরিবর্তন এত বেশি হবে যে বর্তমানের

সঙ্গে তার কোনো মিলই থাকবে না। 'সুতরাং এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে আট কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আরো কয়েক হাজার ইয়োরোপীয় এসে ঢুকলে ভারতবাসীদের স্বার্থের হানি হবে এবং তাদের পক্ষে সেটা অশুভ হবে। বরং ব্যাপারটা হবে উল্টো, ভারতবাসীর কতিপয় পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সে মতই ব্যক্ত করেছেন।'

এ দেশে ইংরেজদের বসবাস-বিরোধীরা এর বিরোধিতা করেন অন্য কারণে—সেটা দেশীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলে নয়। নানা সুবিধের মধ্যে থেকে আমরা একটা সুবিধার উল্লেখ করব। সুতো তৈরি এ দেশে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে কেন? ইংলণ্ডের চাইতে এ দেশে মজুর সস্তা হলেও তারা কাপড় তৈরি করতে পারে এবং আমাদের বাজারে আমাদের চাইতে সস্তায় বিক্রি করতে পারে, যদিও তুলো প্রথমত ইংলণ্ডে পাঠাতে হয় এবং পরে এ দেশে কাপড় তৈরি করে আনা হয় ভাড়া, জাহাজ-খরচা সব দিয়ে। 'এমনটা কি হত যদি ইংলণ্ডে যেমন করে কাপড় তৈরী হয় তেম্নি করে এ দেশে কাপড় তৈরি হত?' নিশ্চয় না। তবে এটা করার বাধা কী? কিছুই না, এবং ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাসের দরুন যে ত্রাস তার এই হল আসল গোপনীয় কারণ। অতিরিক্ত সংখ্যক ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বসবাস করলে ভারতবাসীরা নির্যাতিত হবে, এই মত একই রকম ভ্রান্ত। একই আইনের অধীনে তারা থাকবে এবং দেশীয়রা পায় না এমন কোনো সুযোগ তারা ভোগ করবে না। "একই আইন আদালতের অধীনে, শ্রমের ফলের উপর তারা জীবনধারণ করবে একই আইনদ্বারা রক্ষিত হয়ে, এবং দেশীয় ভাইদের মত একই রকম কর দিতে বাধ্য হবে। তারা শ্রমের, উন্নতির ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি মনোভাব বিস্তার করবে। যে উৎস থেকে সেটা প্রবাহিত হবে তা প্রশংসার, কৃতজ্ঞতার ও আকর্ষণের বস্তু না হয়ে পারে না।" আমাদের ভাইদের আরেকটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে ইয়োরোপীয় ও দেশীয়দের মধ্যে পৃথক, অসমীচীন এবং অপমানকর বিভেদ প্রতিদিনই কমে আসছে এবং তা আরো কমবে যখন ভারতবাসীরা রাষ্ট্রে এখন যেমন পাচ্ছেন তার চাইতে উচ্চপদ পাবেন এবং যখন জ্ঞান ও খবরাখবর আরো সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

তাছাড়া একথা মনে রাখা উচিত ইয়োরোপীয়রা যদি আমাদের দূরে রেখে থাকে তাদেরও আমরা দূরে রেখেছি এই ভেবে যে একসঙ্গে বসলে আমরা অপবিত্র হব। আমরা তাদের নীচ বর্ণ বলে ভেবেছি। যাহক সময় এবং জ্ঞানের প্রসার ও লেনদেনের বিস্তৃতি দু পক্ষেরই এই অসমীচীন কুসংস্কার দূর করবে এবং তা এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ছাড়া হবে না। (কোটেশান—লেখক)

'রিফর্মার'-এর এই মন্তব্য থেকে তার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। অভিপ্রায় হচ্ছে ইয়োরোপীয়দের নৈপুণ্য ও কর্মক্ষমতাকে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে ও ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। কাঁচা মালের অভাব নেই ভারতবর্ষে, কিন্তু সেই কাঁচা মাল কাজে লাগানোর ক্ষমতা ভারতবর্ষে নেই। তাই এখান থেকে তুলো বিলেতে গিয়ে সেখানে কাপড় তৈরি হয়ে ভারতের বাজারে বিক্রী হয় এখানে তৈরী কাপড়ের চেয়েও সস্তা দামে। 'রিফর্মার' এই অবস্থা বদল করবার জন্যে পথও বাত্‌লেছেন, বল্‌ছেন—

'এরকম অবস্থা কি হতে পারত যদি ইংলণ্ডে যে উপায়ে কাপড় তৈরি করা হয়, ঠিক সেই উপায়ে আমরা এখানেও কাপড় তৈরি করতুম? না, কখনই হতে পারতো না।'

(বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

'রিফর্মার' শিল্পবিপ্লব চান ভারতবর্ষে। কাপড়ের কল ও আরো নানা ধরনের কল বসুক এ দেশে এই হচ্ছে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছে। এই পরিবর্তন সাধনের জন্যে কয়েক হাজার ইংরেজ এ দেশে এসে যদি বাস করে ব্যবসার জন্যে তাতে এ দেশের কোটি কোটি লোকের সর্বনাশ তো হবেই না, বরঞ্চ ভাল হবে। তাদের সাহায্য ছাড়া ভারতের যন্ত্রবিপ্লব শুরুই হতে পারবে না। ইয়োরোপীয়রাই কলকারখানা পত্তন করবে, গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের কাঁচা মাল উৎপন্ন করবে, তবে ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হবে। 'কলোনাইজেশন্‌' এই শব্দটিকে ঘিরে সে দিন যে তুমুল বাদবিতণ্ডা চলছিল তার মোদ্দা কথাটি ছিল—শিল্প-বিপ্লব চাই কি শিল্প-বিপ্লব চাই না। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে, বাংলার জমিদারেরা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী

ছিলেন তার বিপক্ষে। আসল কথাটি চাপা পড়ে গিয়েছিল 'কলোনাইজেশন্' শব্দটির তলায়। ইতিহাসের পথ-চলা এম্‌নি করে বার বার ঢাকা পড়ে যায় কথার ধুলোর নীচে।

আমরা আগেই দেখেছি যে মফঃস্বলে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও চাষবাস করবার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্থাপন করেন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বরের টাউন হলের মিটিংয়ে, রামমোহন তার সমর্থন করেন। তার প্রায় এক বছর পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি রামমোহন ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছন। লণ্ডনে পৌঁছনোর পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ডিরেক্টর-দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার ও ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের অধিকার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের আলাপ আলোচনা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই খবরটি ছাপা হয়—

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়

১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুল নগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্বিঘ্নে ঐ নগরে পঁহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে বাবুর আলাপ করণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টা ক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কয়েকজন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমন জন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কম্পানীর বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমাদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলা দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। 'আদালত সম্পর্কীয় কোনো কোনো সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইয়োরোপীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে

ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' (বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত এই খবরটিতে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটির সঙ্গে অবিশ্যি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কোনো সম্বন্ধ নেই। তবুও সেটি প্রণিধানযোগ্য। সংবাদটির উপরে লেখা আছে, "শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়"। দিল্লীর বাদশার দেওয়া 'রাজা' খেতাব তখনো ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট স্বীকার করে নেয় নি বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বস্তুটি থেকে রামমোহনের অভি-প্রায় সুস্পষ্ট। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিক, ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বাস করে চাষবাস করবার অধিকার দিক এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের বৈষম্যহীন এক আইনের আওতায় নিয়ে আসুক ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, রামমোহন তাহলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে পুনর্বার চার্টর পেতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত না হলে ভারতে শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না। রামমোহন তাই ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার বনাম অবাধ,বাণিজ্য-অধিকারের সংঘাতে অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের পক্ষ হয়ে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নিম্ন-লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

রাজা রামমোহন রায়

ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালত সম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়ম সম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায়। ইহার উত্তরপ্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষের আদালত সম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন ঐ সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিত রূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা

মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করা ও আদালত সম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতা করা ও পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওন প্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।

এই সংবাদটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ইতিমধ্যে রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করে নিয়েছেন। জানা যাচ্ছে যে রামমোহনকে পার্লামেন্টীয় কমিটির তরফ থেকে বাণিজ্য, আদালত ও রাজস্ব বিষয়ক নানা লিখিত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আর তিনি তার উত্তর তৈরি করতে ব্যস্ত আছেন। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে পার্লামেন্টীয় কমিটি রামমোহনকে যে প্রশ্ন দুটি করেছিল তার নিম্নলিখিত উত্তর তিনি দিয়েছিলেন--

প্রশ্ন ॥ মূলধনের মালিক ইয়োরোপীয়দের ভারতে সম্পত্তি কিনে তাতে বসবাস করতে দেওয়া ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হবে, না উপকারী হবে?

উত্তর ॥ চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন্ন ইয়োরোপীয়দের যদি ইণ্ডিয়া বোর্ডের অনুমতিক্রমে, বা কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতিক্রমে কিম্বা স্থানীয় সরকারের অনুমতিক্রমে দেশে বসবাস করতে দেওয়া হয় 'তবে চাষের উন্নত পদ্ধতি দেখানোর ফলে এবং মজুর ও অধীনস্থ ব্যাক্তদের প্রাত উপযুক্ত ব্যবহার শেখানোর জন্যে দেশের সম্পদ প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয়দের অবস্থা উন্নত হবে।'

প্রশ্ন ॥ সব ধরণের ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতির ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের উপকার হবে না তার উল্টোটা হবে?

উত্তর ॥ 'দেশীয় অধিবাসীদের সর্ব্বাংশে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গায় ইয়োরোপীয়দের বসানোর জন্যে এবং এ দেশ থেকে এদেশীয়দের বিতাড়িত করার জন্যে এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।' এটা স্পষ্ট যে উচ্চ ও শিক্ষিত ইয়োরোপীয় শ্রেণীর সঙ্গে নীচ ও অশিক্ষিত শ্রেণীর কোনো মিল নেই। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় জাতির চরিত্র, মতামত ও ভাবগত পার্থক্য, বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্ম্মীয় ব্যাপারে পার্থক্য এত বেশি যে দু জাতি একসঙ্গে ইয়োরোপীয় দ্বারা বিজিত দেশে এক সম্প্রদায় হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না।

(কোটেশন—লেখক)

রামমোহনের এই সওয়াল-জবাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শুধু 'Europeans of character and capital' এ দেশে এসে বাস করুক তাই চেয়েছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সাধারণ ইয়োরোপীয়রা পঙ্গপালের মত এ দেশে এসে হাজির হক এ তিনি আদবেই চান নি। এই সাধারণ ইয়োরোপীয়রা এ দেশে যদি দলে দলে আসে তার মানে হবে এ দেশের লোকদের দেশ থেকে খেদিয়ে দেওয়া—সে কথাও রামমোহন তাঁর লিখিত জবাবে বললেন। তবে মূলধনের মালিক এমন ইয়োরোপীয়রা এ দেশে এলে দেশের কল্যাণ হবে। তারা উন্নত কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দেবে এ দেশের লোকদের। তার ফলে দেশের কাঁচা মাল বৃদ্ধি পাবে, দেশের লোকের অবস্থা ফিরবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত ইয়োরোপীয়দের কাছ থেকে এ দেশের লোকেরা শিখবে কেমন করে মজুরদের সঙ্গে ও আশ্রিতদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দৌলতে এক জাতের ইংরেজ তো আসছিলই এ দেশে। তারা এ দেশের কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে বিলেতের কলে তৈরী জিনিস এ দেশে এনে এখানকার কুটীরশিল্পগুলিকে শুধু ভেঙ্গেই দিচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এখানে কোনো কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করছিল না। অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হক ও তার ফলে মূলধনের মালিক ইয়োরোপীয়রা এ দেশে এসে কলকারখানা পত্তন করুক, এ দেশের কাঁচা মাল এ দেশের কলকারখানায় উৎপাদনের কাজে লাগুক—এই ছিল রামমোহনেব ও দ্বারকানাথের অভিপ্রায়। এর ফলে ভারতের যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি হবে তা নয়, সামাজিক উন্নতিও সাধিত হবে। যে জঘন্য আচরণ ক্ষেত-মজুরেরা ও চাষীরা পেত জমিদারদের কাছ থেকে তার পরিবর্তন ঘটবে। অর্থনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাবে শিল্প-বিপ্লব।

এই বিষয়টি নিয়ে রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে রামমোহন লেখেন—

> ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসবাস সম্পর্কে অনেক কথা মাননীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা ও অন্যান্যদের দ্বারা কথিত ও লিখিত হয়েছে এবং এই রাজনৈতিক উপায় অবলম্বনের সুবিধা অসুবিধা

সম্পর্কে নানা অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষেপে এবং খোলাখুলিভাবে এই উপায় থেকে যে ফল আশা করা যায় তা বিবৃত করব।

এই পরিবর্তনে যেসব সুবিধে হবে তার প্রতিই আমি প্রথম দৃষ্টি দিচ্ছি।

সুবিধাগুলি

প্রথমত॥ ভারতের ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা উন্নত ধরনের চাষের যে জ্ঞান তাঁরা রাখেন তা প্রবর্তন করবেন এবং ফসলের উন্নতি সাধন (যেমন চিনির) করবেন যেমন নীলের বেলায় হয়েছে। কারিগরী বিদ্যার উন্নতি এবং কৃষি ও বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতিদ্বারা দেশীয়রা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে।

দ্বিতীয়ত॥ বিভিন্ন শ্রেণীর দেশীয় অধিবাসীর সঙ্গে অবাধ ও বিস্তৃত মেলামেশাদ্বারা ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা তাদের মন থেকে ক্রমে ক্রমে কুসংস্কার দূর করবে। এই কুসংস্কারগুলির দরুন ভারতবাসীর এক বৃহৎ অংশ সামাজিক ও গার্হস্থ্য অসুবিধা ভোগ করছে এবং দরকারী কাজে অনুপযুক্ত হয়ে রয়েছে।

তৃতীয়ত॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা দেশের শাসকদের প্রায় সম-পর্যায়ের লোক বলে এবং উদার-মতাবলম্বী সরকারের অধীন প্রজাদের অধিকারসম্পর্কে এবং বিচারবিধানের সঙ্গত উপায় সম্বন্ধে সচেতন বলে স্থানীয় সরকার থেকে বা ইংলণ্ডের আইনসভা থেকে আইন ও বিচার-পদ্ধতির দরকারী উন্নতির প্রবর্তন আদায় করতে পারবেন; তার সুফল অবশ্য অধিবাসীমাত্রেই ভোগ করবে এবং ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে।

চতুর্থত॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের উপস্থিতি, অনুমোদন ও সমর্থন দেশীয়দের যে কেবল জমিদার ও অন্য উপরিঅলার নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে তা নয়, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকেও রক্ষা করবে।

পঞ্চমত॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা পরোপকার ও সাধারণের মঙ্গল কামনা-প্রণোদিত হয়ে এবং দেশীয় প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতির প্রবর্তনা থেকে দেশব্যাপী ইংরেজি ভাষাচর্চ্চার জন্যে এবং ইয়োরোপীয়

শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার জন্যে ইস্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে দেশীয়দের বৃহৎ অংশের (প্রেসিডেন্সীগুলোতে ও বড় শহরে যারা বাস করেন তাঁরা ছাড়া) জাতীয় উন্নতির এই উপায় পাবার কোনো সুযোগ নেই—ইয়োরোপের সঙ্গে এদেশের কখনো কোনো যোগাযোগ না ঘটলে যেমি হত তেমি তারা আছে।

ষষ্ঠত ॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের ও তাদের বন্ধুদের মধ্যে আদান-প্রদান এবং ইয়োরোপের লোকদের সঙ্গে সম্বন্ধ যত এ দেশের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়গুলি বাড়িয়ে তুলবে, এখানকার জনসাধারণ ও সরকার ততই সত্য সংবাদ পাবেন, ফলে ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে আইন-প্রণয়নে তাঁরা বর্তমানের চাইতে অধিকতর বিচক্ষণ হবেন। বর্তমানে কোনো প্রামাণ্য সংবাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তির বিবৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে সেইসব দলের বিবৃতির উপর নির্ভর করতে হয় যাদের হাতে জনসাধারণের ব্যাপারগুলোর তত্ত্বাবধান রয়েছে। তাঁরা স্বভাবতই নিজের শ্রমের ফল সুনজরে না দেখে পারেন না।

সপ্তমত। পূর্ব বা পশ্চিম কোনো দিক থেকে আক্রমণ হলে সরকার তা রুখতে বেশি সমর্থ হবেন যদি দেশীয় জনসাধারণ ছাড়াও সরকার প্রচুর সংখ্যক ইয়োরোপীয় অধিবাসীর সমর্থন পান, যাঁরা শাসক শক্তির সঙ্গে জাতীয় সহানুভূতিতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগের জন্যে যাঁরা সরকারের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল।

অষ্টমত ॥ একই কারণ দৃঢ় ও চিরন্তন ভিত্তিতে গ্রেট বৃটেন ও ভারতের সম্পর্ক রক্ষার্থে সক্রিয় হবে যদি পার্লামেণ্টের তত্ত্বাবধানে এবং এরূপ আরো এ দেশে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনগত রক্ষাকবচ বীজদ্বারা ভারত উদার নীতিতে শাসিত হয়। এভাবে ভারত অসীমিত সময়ের জন্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে ঐক্য এবং তার প্রগতিশীল প্রশাসনের সুযোগ লাভ করবে। প্রতিদানে ইংলণ্ড এ দেশের মহত্ত্ব রক্ষা করবে।

নবমত ॥ যদি এমন ঘটনা ঘটে যে দু দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায় তবু প্রচুর সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর অস্তিত্ব (যাঁরা ইয়োরোপীয় ও তাঁদের বংশ-

ধর, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, ইংরেজি ভাষা বলেন এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান রাখেন) পূর্বের এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে ইয়োরোপের বড় খ্রীষ্টান দেশগুলোর সমতুল্য করে তুলবে এবং প্রভূত ঐশ্বর্য ও অগণিত লোকসংখ্যার দ্বারা ও ইয়োরোপের সাহায্যদ্বারা তাঁরা (অধিবাসী ও তাঁদের বংশধর) দু দিন আগে হক কিংবা পরে হক এশিয়ার আশে পাশের জাতিদের আলোক ও সভ্যতা দান করতে পারেন।

আমি এখন যেসব অসুবিধার আশঙ্কা করা যেতে পারে সেইসব প্রধান প্রধান অসুবিধার কথা বলব। তৎসঙ্গে তা নিবারণ করবার অথবা সেগুলির পুনরাবৃত্তি যাতে ঘন ঘন না হয় তার প্রতিকারের কথাও বলব।

অসুবিধাগুলি

প্রথমত॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা একটি বিশিষ্ট জাতি বলে এবং তাঁরা দেশের শাসকদের সমশ্রেণীর লোক বলে তাদের এ দেশীয় অধিবাসীদের উর্ধ্বে উঠবার একটা প্রবণতা থাকতে পারে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে অবদমিত করে স্বতন্ত্র অধিকার ও সুযোগ লাভের লক্ষ্য থাকতে পারে। ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা অন্য ধর্মাবলম্বী বলে এদেশীয়দের মনে আঘাত দেবার কাজে প্রবৃত্ত হতে পারেন এবং দেশীয়দের অন্য মত, বর্ণ ও অভ্যাসের দরুন তাদের অপমানিত করতে পারেন।

এর প্রতিকারে আমি প্রস্তাব করি, প্রথমত, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যাঁরা অধিকতর শিক্ষিত তাঁরা নিম্নশ্রেণীর লোক-দের চাইতে এদেশীয়দের কম উৎপাত ও অপমানিত করেন তাই যে সব ইয়োরোপীয় এ দেশে বসবাস করবেন অন্তত প্রথম কুড়ি বছর শিক্ষিত চরিত্রবান ও মূলধনবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ওঁদের বেছে নিলে ভাল হয় কারণ এসব ব্যক্তি কদাচ অশিক্ষিত মানুষদের জাতীয় ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে হস্তক্ষেপ করেন।

দ্বিতীয়ত॥ 'একই প্রকার আইন প্রণয়ন যে আইনগুলি সব শ্রেণীগুলিকে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জুরী-

দ্বারা বিচার (যে জুরী নিরপেক্ষভাবে দুই শ্রেণীর লোক নিয়েই গঠিত)— এই দু'টি ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যারা উদ্ধত ও উদ্দাম তাদের কঠোর-ভাবে সংযত করবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধাটি এ প্রকার : ইয়োরোপীয়রা দেশীয়দের চাইতে বেশি সুবিধা পান কারণ তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট সহজে যেতে পারেন যেহেতু তাঁরা তাঁদের নিজের দেশবাসী। অনেক উদাহরণের অভিজ্ঞতা থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এইরূপ সুযোগপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেলে এই বৃদ্ধি দেশীয়দের অনেক ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করবে।

আমি তাই প্রতিকারের একটি উপায় প্রস্তাব করি যে দেশীয় উকিল ছাড়াও ইয়োরোপীয় উকীল দেশীয় আদালতে নিযুক্ত করা হক যেমন প্রেসিডেন্সীগুলির রাজ-দরবারে করা হয়ে থাকে। সেখানে উল্লিখিত অন্যায় অনুভূত হয় না কারণ কৌঁসুলী ও এটর্নীগণ দেশীয় হক, ইয়োরোপীয় হক উভয় পক্ষের হয়ে জজের নিকট যেতে পারেন এবং 'সর্বক্ষেত্রে একই অধিকার ভোগ করে' সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে মক্কেলের মামলার ওকালতি করতে পারেন।

তৃতীয় অসুবিধা এই যে বর্তমানে ভারতের মফঃস্বল অঞ্চলে দেশীয়রা জনসাধারণের কর্মে যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের ছাড়া এবং সৈন্য ও তাদের অফিসারেরা যাঁরা কোনো এক জায়গায় মোতায়েন থাকেন কিংবা যাতায়াত করেন তাঁদের ছাড়া কোনো ইয়োরোপীয় দেখবার সুযোগ পায় না। ফলে এই দেশীয়রা ইয়োরোপীয়দের উচু বলে মনে করে এবং তাদের কাছে নতি স্বীকার করতে সহজেই রাজি হয়। কিন্তু যদি সর্বশ্রেণীর ও সর্ব পদের ইয়োরোপীয়দের দেশে বসবাস করতে দেওয়া হত তাহলে এদেশীয়রা তাঁদের সঙ্গলাভ করে বর্তমানে ইয়োরোপীয় চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা তারা পোষণ করছে তা অনেক পরিমাণে বদলে ফেলত। স্বার্থের এবং কুসংস্কারের অবিরাম সংঘর্ষ দেশীয় ও ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে ক্রমে একটা সংগ্রাম পাকিয়ে তুলতে পারে যতদিন না এক জাতি অন্য জাতিকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠে যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থা এমন অসুবিধাজনক করে তোলে যে কোনো সরকারী মধ্যস্থতাই ফলপ্রসূ হবে না কিংবা সাধারণের মধ্যে শান্তি

রক্ষা করতে পারবে না। বঙ্গদেশের মফঃস্বল অঞ্চলে তা না ঘটলেও তবু মনে রাখা উচিত যে বাঙ্গালীদের আচরণ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না (যাদের নতি স্বীকারের মনোভাব এবং শক্তিহীনতার অপবাদ আছে) যে সিদ্ধান্ত উত্তরের প্রদেশগুলির লোকদের সম্বন্ধে খাটে—তাদের মন-মেজাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। এই তেজস্বী জাতি যদি অপমানিত হয় তাহলে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই উপরি-উক্ত গণ্ডগোল ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থার ফলে দেশ দুর্বল হবে কিংবা সময় সময় অনেক রক্তপাত ঘটাবে এদেশবাসীদের শাসনে রাখতে।

পূর্বের নির্দেশিত প্রতিকার (তৃতীয় অনুচ্ছেদ, প্রথম নিবন্ধ, প্রথম প্রতিকার) এই বিষয়েও প্রযুক্ত হতে পারে. তা হল পূর্বেই বর্ণিত সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর সঙ্গে ইয়োরোপীয় বাসিন্দেদের মেলামেশায় বাধা। এ শ্রেণী যে কেবল ইয়োরোপীয়দের চরিত্রকেই উন্নততর পৈঠায় নিয়ে যেতে পারবে তা নয়, তাঁরা দেশীয় প্রতিবেশীদেরও অজ্ঞতার ও কুসংস্কারের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবেন। এভাবে তাঁরা এদেশীয়দের প্রীতি লাভ করবেন এবং এই সরকারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করে দিতে পারবেন যে গভর্মেণ্টের শাসনে তাঁরা আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাম্য ও প্রিয় স্বাধীনতা ও সুযোগ ভোগ করতে পারবেন।

কেউ কেউ চতুর্থ বিপদ রূপে এই আশঙ্কা করেন যে যদি ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের উদাহরণ দ্বারা ভারতবাসীকে ধনে, বুদ্ধিতে ও জনচেতনায় উন্নত করা হয়—তাহলে যে মিশ্র সম্প্রদায় তার ফলে গঠিত হবে তা গ্রেট বৃটেনের শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে (যেমন আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র পূর্বে করেছে) এবং পরিশেষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আমেরিকাবাসীরা কুশাসনের দরুন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল অন্যথায় তারা বিদ্রোহ করত না এবং ইংলণ্ড হতে আলাদা হয়ে যেত না। কানাডাই তার জলন্ত প্রমাণ যে মোটামুটি ভাবে সুশাসিত হলে মাতৃভূমি থেকে আলাদা হবার বাসনা একটা জাতের স্বাভাবিক ইচ্ছা হতে পারে না। ঠিক সেই মতই ভারতের মিশ্র সম্প্রদায় যতদিন উদার ব্যবহার পাবে এবং প্রগতিশীল শাসনা-

ধীন থাকবে ততদিন ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কোনো মনোভাব দেখাবে না—কেননা এই সম্বন্ধ উভয় দেশের পক্ষেই প্রভূত কল্যাণদায়ক হবে। তবু যেটা আগে বলা হয়েছে, যদি কতকগুলি ঘটনার কারণে উভয় দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে (যা বহু আকস্মিক কারণ থেকে ঘটতে পারে যেগুলি সম্পর্কে অনুমান বা ভবিষ্যৎবাণী করা বৃথা) তত্রাচ দুটি মুক্ত ও খ্রীষ্টান দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরের সুবিধাদায়ক ব্যবসায়িক যোগাযোগ রক্ষিত হতে পারবে। কেননা তারা তখন ভাষা, ধর্ম ও আচারের সমতায় মিলিত হবে।

ভারতে ইয়োরোপীয়গণের বসবাসের পথে পঞ্চম বাধা হল যে ভারতের অনেকাংশে জলবায়ু ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কারক অথবা অনিষ্টকর হতে পারে। যার ফলে অনেক ইয়োরোপীয় পরিবার যাদের ইয়োরোপে গিয়ে বসবাস করবার উপায় আছে, তাঁরা বাধ্য হয়ে ক্ষতি স্বীকার করেও সম্পত্তি ছেড়ে দেবেন, অথবা সম্পত্তি নষ্ট হতে দেবেন এবং ভারতকে সমৃদ্ধ করার বদলে নিজেদেরই নিঃস্ব করবেন। এর প্রতিকার হিসেবে আমি প্রস্তাব করি যে অনেক ঠাণ্ডা এবং স্বাস্থ্যকর জায়গা বেছে নিয়ে সে জায়গাগুলিতে ইয়োরোপীয় বাসিন্দেদের প্রধান ঘাঁটি করা যায় (যেখানে তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার বসবাস করে অনুকূল ঋতুতে সম্পত্তির বিষয় তত্ত্বাবধান করতে পার-বেন এবং যদি তাদের উপস্থিতি আবশ্যক হয় তাহলে মাঝে মাঝে গরমের মাসে তা পরিদর্শনও করতে পারবেন। যেমন, সাপ্পাটো, নীলগিরি পাহাড় এবং এমন অন্যান্য জায়গা যা ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। সর্ব ব্যাপারেই মনে রাখতে হবে যে ভারতে এই ইয়োরোপীয় বাসিন্দেদের বসবাস বাধ্যতামুলক নয়, সম্পূর্ণত তাঁদের ইচ্ছাধীন।

এর সঙ্গে কতগুলো ছোট অসুবিধার কথা জুড়ে দেওয়া যায়, যদিও তা জরুরী নয়। এর উপর (এবং উপরে উল্লেখিত অবস্থা) বিশেষ বিবেচনা এবং নিরপেক্ষ চিন্তা দেওয়া উচিত। সে যাই হক আমি বিশ্বাস করি কেউই আমার বিরোধিতা করবেন না যখন আমি বলি যে ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাস মাঝারি পরিকল্পনায় পরীক্ষামূলকভাবে

গ্রহণ করতে হবে যাতে তার ফল বাস্তব সমীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারবে। যদি ফল এমন হয় যে সপক্ষ-বিপক্ষ সব দলই তাতে সন্তুষ্ট, তাহলে সে ব্যবস্থা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যেতে পারে। এই রকমই চল্‌বে যতদিন না অবশেষে দেশের দ্বার সর্বশ্রেণীর বহিরাগতদের জন্যে অবারিত করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক মনে হয়।

সুতরাং, গভীরভাবে বিবেচনা করে আমি অশঙ্কিতচিত্তে সুপারিশ করি যে চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের এখন ভারতে বসবাস করবার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া হক। কোন্ জায়গায় তাঁরা বাস করবেন সে সম্বন্ধে কোনো বাধা থাকবে না এবং গভর্মেন্টের খুশিমত তাঁদের নির্বাসিত করবার আশঙ্কাও দূর করতে হবে। এই পরীক্ষার ফল এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়নে অগ্রদূত হয়ে থাকবে।

১৪ই জুলাই, ১৮৩২ রামমোহন রায়
লণ্ডন।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে তার কি ফলাফল হতে পারে সে সম্বন্ধে রামমোহন বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর এই বিবৃতিটিতে। ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের ভালর দিক ও মন্দর দিক, দুই দিকই তিনি ধরে দিয়েছেন সকলের কাছে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বাস করলে কৃষির উন্নত প্রণালী, জমিকে সুফলা করবার যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদের আছে সেই জ্ঞান, যন্ত্রসংক্রান্ত টেক্‌নিকাল জ্ঞান ও বাণিজ্যসংক্রান্ত জ্ঞান—এইসব শিক্ষা করে লাভবান হবে এ দেশের লোক। তাছাড়া ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে এ দেশের লোকের নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর হবে, যেসব কুসংস্কার ভারতের লোকদের নানা প্রয়োজনীয় কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বসবাস করলে বিচারপ্রণালীতে ও আইন-বিষয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হবে, জমিদারদের ও রাজকর্মচারীদের নিপীড়নের হাত থেকে দেশের লোক বাঁচবে, তারা বিদ্যালয় ও নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পত্তন করবে এ দেশে যেখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানো হবে, পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি

অনুসারে ভারত শাসিত হবে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে নানা শক্তির আক্রমণ ঠেকাতে পারবে ভারতবর্ষ। ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ হয় ভারতবর্ষ উদারনৈতিক পার্লামেণ্টীয় শাসনের বন্ধনে, তো হল, আর যদি তা নাও হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলেও কিছু সংখ্যক ইয়োরোপীয়রা ভারতে বাস করলে বিজ্ঞান, রাজনীতি ও উৎপাদন-যন্ত্র সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান এ দেশের লোকের প্রভূত উপকার সাধন করবে এবং এশিয়ার অন্য অন্য দেশগুলিতেও জ্ঞানের ও সভ্যতার বিস্তার করবে।

এইগুলি হল রামমোহনের মতে ইংরেজদের এ দেশে বসবাসের ভালর দিক। মন্দর দিকে তিনি দেখিয়েছেন যে শাসকদের স্বজাতি হওয়ায় যে ইংরেজরা এ দেশে বাস করবে তারা এদেশবাসীদের উপর প্রভুত্ব ফলাবে, নানারকম সুযোগ সুবিধে আত্মসাৎ করবে আর এ দেশের লোকদের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হানবে। গভর্মেণ্টের লোকেরা তাদের নিজেদের দেশের লোক হওয়ায় এই ইংরেজরা খুব সহজেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে যা এ দেশের লোকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর সুযোগ ইয়োরোপীয় বাসিন্দেরা নেবে। ইয়োরোপীয়রা এদেশে বাস করে যদি বিবেচনার সঙ্গে সংযতভাবে এ দেশের লোকদের সঙ্গে ব্যবহার না করে তো বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকবে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের, ফলে রক্তপাত ঘটাও বিচিত্র নয়।

এই অপকারগুলো ঘটতে পারে যদি ইয়োরোপীয়রা এ দেশে স্থায়িভাবে বাস করে। তাই রামমোহন বলেছেন যে এটিকে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সাবধানতার সঙ্গে, আর শুধু সেইসব ইয়োরোপীয়দের ভারতে বাস করতে দেওয়া যেতে পারে যারা শিক্ষিত, উন্নত-চরিত্র ও মূলধনের অধিকারী—

> 'শিক্ষিত, চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভারতে বসবাস করবার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া উচিত।'

ইংরেজরা দলে দলে এসে পঙ্গপালের মত এ দেশের মাঠ উজাড় করে ফসল খেয়ে যাক এ সর্বনাশী কল্পনা রামমোহনের মাথায় কখনো আসে নি, আসা সম্ভবও ছিল না। ভারতবর্ষের অবনতি দেখে তিনি দুঃখে ও ব্যথায়

জলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বমানবসভায় তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান ও কর্ম। তিনি স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধীনে এসে গেছে। দেশ তখন শতধা বিভক্ত। কোনো সংহত জাতীয় শক্তিই তখন নেই এ দেশে। দিল্লীর বাদশার বাদশাহী তখন গোধূলিগ্রস্ত। সেই বাদশাহী ছিল জায়গীরদারী সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অগ্রগতির পায়ের শিকল ছিল সেই বাদশাহী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধাপে ভারতবর্ষকে উন্নীত করবার কোনো সামর্থ্যই তার ছিল না। ইংরেজ বণিক এল এই দেশে, রামমোহনের আমন্ত্রণে তারা আসে নি। এসেছিল তারা এ দেশে ঐতিহাসিক শক্তির ধাক্কায়—বাজার-সন্ধানে। তারপরে বণিকেরা বাঁ হাতে ধরল দাড়িপাল্লা, ডান হাতে নিল রাজদণ্ড। ইংরেজ রাজত্ব গেড়ে বসল এ দেশে। এই সময়ে রামমোহনের আবির্ভাব। ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়ানোর শক্তি তখন এ দেশের লোকের বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই রামমোহনেরও ছিল না। এ দেশের লোক তখন এক দিকে ইংরেজের পদলেহন করছে, অন্য দিকে ক্লীবের মত মনে মনে ব্যর্থ বিদ্বেষ পোষণ করছে। কি শক্তির প্রতীক স্বরূপ ইংরেজ এ দেশে এসেছে, সেই শক্তি ভারতের কল্যাণকর হবে কি না, ইংরেজকে দিয়ে সেই কাজগুলো কি করে করিয়ে নেওয়া যায় ভারতের উন্নতির জন্যে—এসবের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না এদেশবাসীর। সমাজের মোড়ল হিসেবে যাঁরা ছিলেন, 'ধর্মসভা'র সেই নেতারা, তাঁদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা বলে বস্তুটির কোনো বালাই ছিল না। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাত যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছিল তার আলোকে এঁরা চোখ বন্ধ করে পেচকবৃত্তির দ্বারা স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই বন্ধ্যা সামাজিক অবস্থার মধ্যে দেখা দিলেন ঐতিহাসিক-চেতনাসম্পন্ন রামমোহন রায় ও তাঁর সহকর্মী ঐতি-হাসিকবোধসম্পন্ন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সচেতনভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই দুই জন, ভারতবর্ষের নৌকা যা বদ্ধ জলে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তাঁদের জ্ঞানের ও কর্মের গুণ দিয়ে টেনে নিয়ে বিশ্বের স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। ইংরেজ বণিক এসেছিল তার মতলব সিদ্ধ করতে; তারা এসেছিল অর্থের জন্যে, পরমার্থের জন্যে নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের

আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কি করে ইংরেজদের উপস্থিতিকে ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে সেইটে ছিল রামমোহনের ও দ্বারকানাথের সাধনার বিষয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক—সর্বদিক থেকে পরিবর্তন আন্‌তে হবে ভারতবর্ষে। ঐতিহাসিক ধারা ভারতবর্ষের পাড় দিয়ে বইছিল না। বদ্ধজলে অনড় নৌকোর মত দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। তাকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে শক্তি দরকার সেই শক্তি ইংরেজ জাতির কাছ থেকে আহরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাদেরই সে দিন মাল্লা করে ভারত-তরীকে বদ্ধ জল থেকে স্রোতের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এইটি ছিল ইতিহাসের নির্দেশ সে যুগে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন। তাই ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্যে দুটি অসামান্য পুরুষ সে দিন এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।

নাম-সূচী

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ। শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গীতে সহজ সরল সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, সেকালের ঋষি ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।'

—**নন্দলাল বসু**

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক যে পড়তে পেলুম তার জন্য 'রূপা কোম্পানী'-কে ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলীর সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষণীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্য-গুণে আজও সমান আনন্দদায়ক।

বিষ্ণু দে, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৬৯

'চিত্রশিল্পেও কথাশিল্পের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সেজন্য যাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই রূপতত্ত্ব ও শিল্পের নানা দিকের কথা পড়লে লাভবান হবেন। খুব যত্ন করে ছাপা, সুন্দর একখানি ফোটোগ্রাফসহ কাপড়ে বাঁধাই। দাম খুবই শস্তা। ....'

পরিমল গোস্বামী, যুগান্তর, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৯

আইনস্টাইন

জীবন-জিজ্ঞাসা

সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। এ যুগের একজন অদ্বিতীয় মানবদরদী মহাপুরুষের মানসলোকের গঠন ও গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই রচনা-সংকলনে। আইনস্টাইনের জীবিতকালে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে এ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলি। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে বিশ্বের কোন ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

বিজ্ঞান-রাজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রদের মত কৌতূহলাবৃত অসীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার পরিচায়ক এই গ্রন্থ—জীবন-জিজ্ঞাসা।

জাতীয় অধ্যাপক, **সত্যেন্দ্রনাথ বসু** তাঁর ভূমিকায় বলেছেন :

"শ্রীমান শৈলেশ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি আইনস্টাইনের নানাবিধ প্রবন্ধের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি, যাতে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বে বিজ্ঞান ছাড়া যে একটি বিশেষ দিক ছিল এবং সেটি যে তাঁর মূল অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের যা তিনি বিশ্বাস করেন, তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। আমি আশা করি যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর দ্বারা অনূদিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের মত একজন বিরাট মানুষের ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাবেন। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।'

দাম : ৮·০০ টাকা

নৈরাজ্যবাদ

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই নিরাজ সমাজের কল্পনা করেছেন। নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তির দূত। তথাপি নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে নৈরাজ্যবাদীরা হিংসা ও বল প্রয়োগের পথে চলে এবং এদের নিরাজ সমাজ অরাজ ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজেরই নামান্তর। লেখক নৈরাজ্যবাদের এই বৈপ্লবিক দিকটা দেখিয়েছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন সমাজে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যা টলস্টয়, গান্ধী, অরবিন্দ প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাজ্যবাদের (Spiritual Anarchism) শ্রেষ্ঠতাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং এই ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে রয়েছে। এই নব নৈবাজ্যবাদ—বিত্ত ও ক্ষমতার উন্মাদ কামনার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সাবধানবাণী।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের বিস্তার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা সম্বলিত এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার একটি অমূল্য সম্পদ।

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

সংকলক ও অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'ফ্রান্স—স্বচ্ছ যুক্তি, রুচিস্নিগ্ধ শিল্পীমন, রসগ্রাহী আবেগপ্রবণতার দেশ। আমাদের দেশ সম্বন্ধে সে-দেশের শিক্ষিত জনমনে বহুদিনের কৌতূহল। বিশ্ব-মানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীরা নতুন ক'রে ভালবাসতে শেখেন শাশ্বত এই ভারতবর্ষকে। ···প্রথম যে ফরাসী রসিক রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে মুগ্ধ হন এই শতকের সূচনায়, তাঁর নাম আজ সকলেই জানে : কবি স্যাঁ-জন্ পার্স। তিনি তৎপর হয়েছিলেন বলেই ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করলেন বিখ্যাত কবি আঁদ্রে জিদ্। তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি। তারপর, এই পঞ্চাশ বছরে ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে জানতে চেয়েছে, জেনেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। স্যাঁ-জন্ পার্স, আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু ক'রে হাল আমলের অগণ্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তারই কয়েকটি এখানে সংকলিত হ'ল মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে। সাহিত্যরসিকের কাছে যেমন, তেমনি ঐতিহাসিকের কাছেও অমূল্য অপরিহার্য এই সংকলন।

দাম : ৫·০০ টাকা

বারট্রাণ্ড রাসেল

সুখের সন্ধানে

অনুবাদক : পরিমল গোস্বামী

মানুষের আনন্দের উৎস অংশতঃ অন্তরঙ্গ, আর অংশতঃ বহিরঙ্গ। এই গ্রন্থে সেই অন্তরঙ্গ দিকটাই আলোচিত হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন তা যদি পাওয়া যায়, আর শারীরিক সুস্থতা যদি থাকে তাহলেই প্রতিটি মানুষ সুখী। তবু আনন্দ সুদুর্লভ। কেন? বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে স্বীকৃত বারট্রাণ্ড রাসেল, সেই সমস্যার সমাধান উপস্থাপিত করেছেন, আর মনকে কি ভাবে সঞ্চালিত করলে সুখলাভ সম্ভব তা আলোচনা করেছেন।

'..বিদগ্ধ জনের জন্যে লেখা দুরূহ চিন্তাচ্ছন্ন প্রবন্ধ পুস্তক এটি নয়। যেসব মানসিক অশান্তি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হয় অথচ যা মানুষের জীবনকে অনেক সময় ব্যর্থ পর্যন্ত করে দিতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা এই বাধাসমূহকে সহজেই দূর করা সম্ভব, মাত্র সতেরটি অধ্যায়ে লেখক অতি সুন্দরভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

দেশ, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬০

'এমন একদিন ছিল, প্রয়োজনমত আহার, বাসস্থানের সংস্থান করতে পারলেই মানুষ যখন সুখী হত। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন অনেক কিছু পেল তেমনই হারাল তার মানসিক শান্তি অর্থাৎ সুখ। সুখ কী, সুখী হবার কী উপায়, মানুষ অসুখী হয় কেন, এইসব প্রশ্ন মনোবিদদের মত আমাদের মনেও অশান্তি সৃষ্টি করে।.. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব আপাততুচ্ছ অশান্তি মনকে বিষিয়ে তোলে, জীবনকে প্রায় নিরর্থক জ্ঞান করতে প্ররোচনা দেয়, সেগুলি দূর করা শ্রমসাধ্য হলেও যে অসম্ভব নয়, এই গ্রন্থের সতেরটি অধ্যায়ে লেখক তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।..গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, "যেসব ব্যবস্থা আমি পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন করলাম, তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থিত এবং নিজে যেখানেই এ ব্যবস্থা অনুসরণ করেছি সেখানেই সুফল পেয়েছি।".. জীবনের উপলব্ধ সত্যকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন বর্তমানকালের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক।...শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর তর্জমা যেমনই স্বচ্ছন্দ, তেমনই সাবলীল। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই।'

আনন্দবাজার পত্রিকা,' ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬১

দাম : ৫·০০ টাকা

বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের অগ্নিচক্র ঘুরেছে ভারতের উত্তরে আর দক্ষিণে। কিন্তু পূর্ব ভারতের তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাঙালী। সেই খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। তবুও নতুনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অসাধারণ শক্তিতে সে আজো ভাস্বর। তার বর্তমান বিপর্যয় এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আপনার বইখানি পড়িয়া আনন্দিত ও লাভবান হইলাম। আপনি বাঙালীর কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

এই সুন্দর পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তাশীল পাঠকসমাজে ইহার আদর হইবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খুব ভালো লেগেছে, আগাগোড়া সমান তৃপ্তি পেয়েছি। ছোট্ট বইটিতে আপনি এত কথা কি করে লিখলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি দেশের ইতিহাসে আপনার দৃষ্টি ও অনুরাগের গভীরতা দেখে। এঁতটা অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকদেরও নেই। আপনার মনন, অধ্যয়ন ও দৃষ্টি সার্থক।

নীহাররঞ্জন রায়

বিভিন্ন আকর হইতে অতি মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আহরণ করিয়া বাঙালীকে বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহা উচ্চ অঙ্গের সংশ্লেষ শক্তির পরিচয় বহন করে। মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বইখানির অন্যান্য দেশী ভাষায় অনুবাদ ও বহুল প্রচার কামনা করি।

কালিদাস নাগ

দাম ঃ ৬'০০ টাকা

আমার ঘরের আশেপাশে

ডঃ তারকমোহন দাস
এম.এস-সি., পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন), ডি.আই.সি.
রীডার, কৃষিবিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশু-পক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উদ্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষদেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবোধ কতো নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা আজও পথে-প্রান্তরে জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রঙীন করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই।—কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের জাতীয়মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর লক্ষ্য।

দাম : ৫·০০ টাকা

অন্যান্য বই

স্মৃতিকথা

ছায়াময় অতীত—মহাদেবী বর্মা ৪·০০
অনুবাদ : মলিনা রায়

উপন্যাস

চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায় ৬·০০
অস্তগামী সূর্য—ওসামু দাজাই ৪·৫০
অনুবাদ : কল্পনা রায়

বাতাসী বিবি—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.] ৪·০০
শেষ গ্রীষ্ম—বরিস পাস্টেরনাক ৩·০০
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মোনা লিসা—আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া ২·৫০
অনুবাদ : বাণী রায়

এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী ৫·০০
অপমানিত ও লাঞ্ছিত—ডস্টয়েভস্কি ৮·০০
অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনা : গোপাল হালদার

ছোটগল্প

শহরতলির শয়তান—বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৪·৫০
অনুবাদ : অজিত কৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.]

বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০
স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) ৫·০০
স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫·০০
অনুবাদ : দীপক চৌধুরী

অনেক বসন্ত দু'টি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩·৫০
চীনা মাটি (চীনা ছোটগল্প সংকলন) ৬·০০
অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যঙ্গ-কাহিনী

ইতস্ততঃ—এককলমী [পরিমল গোস্বামী] ৬·০০

বিচিত্র-কাহিনী

যাদু কাহিনী—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.] ৮·০০

ভ্রমণকাহিনী

শৈলপুরী কুমায়ুন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৫·০০